অন্বেষণ

প্রফুল্ল রায়

সাহিত্যম্ । ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

মিনিট কুড়ি আগে এয়ার-বাস থেকে নেমে ক্যালকাটা এয়ারপোর্টের টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের ভেতর চলে এসেছিল সুজাতা। এই মুহূর্তে কাচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড একটা ঘরে কনভেয়র বেল্টের সামনে আরো দু-আড়াই শ যাত্রীর সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে আছে।

তার পুরো নাম সুজাতা কুলকার্ণি। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। মাঝারি হাইট, ঝকঝকে ধারাল চেহারা। গায়ের রং ফর্সাও নয়, কালোও নয়, দুইয়ের মধ্যবর্তী। পরনে মেরুন রঙের দামি মাইসোর সিল্ক, শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ। ডান হাতে ইলেকট্রনিকস ঘড়ি এবং বাঁ হাতের মাঝখানের আঙ্গুলে হলুদ পোখরাজের একটা আংটি ছাড়া আর কোনো সাজের জিনিস চোখে পড়ছে না। বিবাহিত মারাঠি মেয়েদের গলায় যে মঙ্গলসূত্র থাকে, সুজাতার তা নেই। বোঝা যায়, এখনও তার বিয়ে হয় নি। এই সামান্য সাজেই তাকে প্রায় অপার্থিব মনে হচ্ছে।

এদিকে যাত্রীরা নেমে যাবার পর পোর্টাররা এয়ার-বাসের পেট থেকে মালপত্র বার করে এনে কনভেয়র বেল্টের ওপর রাখতে শুরু করেছে। চওড়া বেল্টটা গাদা গাদা সুটকেশ, বাস্কেট, সুদৃশ্য বেত বা প্লাস্টিকের ঝুড়ি, ঢাউস ঢাউস চামড়ার ব্যাগ এবং প্যাকেট নিয়ে অদ্ভুত ধাতব শব্দ করে যাত্রীদের সামনে দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছে। যাত্রীরা টপটপ যে যার লাগেজ তুলে নিয়ে বাইরের লাউঞ্জের দিকে চলে যাচ্ছে।

সুজাতার সুটকেশ টুটকেশ এখনও আসে নি। কনভেয়র বেল্টের দিকে চোখ থাকলেও তার মাথায় এক ধরনের চাপা টেনসন কাজ করছিল। এই প্রথম কলকাতায় আসছে সে। এখানকার সব কিছুই তার অচেনা। অবশ্য বাবার বন্ধু শিবনাথ মুখার্জিকে মাসখানেক ধরে চিঠি লিখে লিখে তার আসার খবর জানানো হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে এই মেট্রোপলিসে আসছে তাও। তা ছাড়া কাল রাত্তিরে বম্বে থেকে ট্রাঙ্ক কলে তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছে সুজাতা। শিবনাথ আঙ্কল নিজে এসে এয়ারপোর্ট থেকে তাকে

নিয়ে যাবেন।

শিবনাথের কথা মনে পড়তেই কনভেয়র বেল্ট থেকে মুখ ফিরিয়ে ডান পাশের কাচের দেয়ালের দিকে তাকাল সুজাতা। দেয়ালের ওপারে অগুনতি মানুষের মুখ। এরা সবাই প্লেনের যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব—এয়ারপোর্টে তাদের রিসিভ করতে এসেছে।

ভিড়ের ভেতর শিবনাথকে খুঁজতে লাগল সুজাতা। যদিও বছর সাতেক আগে শেষ দেখেছে তাঁকে তবু তাঁর চেহারা পরিষ্কার মনে আছে। সাত বছরে একজন বয়স্ক মানুষের মুখচোখ বা শারীরিক কাঠামো কতটা আর বদলাতে পারে! সুজাতার ধারণা,দেখামাত্রই সে তাকে চিনতে পারবে। কিন্তু এত মানুষের মধ্যে শিবনাথকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি কি এখনও এয়ারপোর্টে আসেন নি?

আমেরিকায় বেশ কয়েকটা বছর একা একাই কাটিয়ে এসেছে সুজাতা। ইওরোপের নানা দেশেও টুরিস্ট হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছে। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলল, শিবনাথ যদি কোনো কারণে এয়ারপোর্টে না আসতে পারেন, ট্যাক্সি নিয়ে সোজা যোধপুর পার্কে শিবনাথদের বাড়ি চলে যাবে। একা একা যে নিউইয়র্ক লণ্ডন প্যারী কোপেনহেগেন বা অসলো ঘুরতে পেরেছে তার পক্ষে নিজের দেশের একটা শহরের ঠিকানা খুঁজে বার করা কোনো সমস্যাই নয়।

এদিকে পোর্টাররা আরো মালপত্র এনে কনভেয়র বেল্টে চাপিয়ে দিয়েছে। কাচের দেওয়াল থেকে সুজাতার চোখ ফের ঘুরন্ত বেল্টের ওপর ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুটকেশ এবং চামড়ার বড় হ্যাণ্ড-ব্যাগটা দেখতে পেল সে। দু হাতে সেদুটো তুলে নিয়ে সুজাতা যখন ডান পাশের লাউঞ্জের দিকে যাচ্ছে লাউড স্পিকারে নিজের নামটা কানে এল। অদৃশ্য ঘোষিকা ইংরেজিতে জানাচ্ছে, বম্বে থেকে কিছুক্ষণ আগে যে এয়ার-বাসটা এসেছে তার প্যাসেঞ্জার সুজাতা কুলকার্ণি যেন অনুগ্রহ করে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের এনকোয়ারি কাউণ্টারে চলে আসেন। তাঁর জন্য অনিমেষ মুখার্জি অপেক্ষা করছেন।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল সুজাতা। অনিমেষ কে হতে পারে? এমন নাম আগে আর কখনও সে শুনেছে বলে মনে হল না। পরক্ষণেই মুখার্জি

পদবিটার কথা ভেবে আন্দাজ করল, শিবনাথ হয়তো তাঁকে পাঠিয়েছেন। নইলে এই শহরে আর কারো পক্ষেই তার নাম জানা সম্ভব নয়।

সুজাতা আর দাঁড়াল না, কাচের দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। অনেক দূরে লাউঞ্জের মাঝামাঝি জায়গায় এনকোয়ারি কাউন্টারটা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে তার মনে পড়ল, শিবনাথের দুই ছেলেকে ছেলেবেলায় দিল্লিতে দেখেছে। তাদের কারো নাম মনে নেই। হয়তো এই দু'জনের কেউ অনিমেষ হবে।

এনকোয়ারিতে যে সুশ্রী স্মার্ট তরুণীটি বসে আছে তার কাছে গিয়ে নাম বলতেই মেয়েটি ওধারের একটি যুবককে দেখিয়ে বলল, 'দিস জেন্টলম্যান ইজ ওয়েটিং ফর ইউ।'

দ্রুত যুবকটিকে অর্থাৎ অনিমেষকে এক পলক দেখে নিল সুজাতা। মেদশূন্য টান টান চেহারা। ছড়ানো কাঁধ, সরু কোমর, চওড়া কপাল। চুল নিখুঁতভাবে ব্যাক-ব্রাশ করা। গায়ের রং তামাটে। ঈষৎ বাদামি চোখে এবং কাটা কাটা মুখে ঝকঝকে বুদ্ধির ছাপ। পরনে সাফারি স্যুট, বয়স সাতাশ আটাশ।

সুজাতা লক্ষ করল, অনিমেষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে বিস্ময় এবং কৌতূহল। সুজাতা কিছু বলার আগেই হাতজোড় করে সে বলল, 'আমি অনিমেষ। শিবনাথ মুখার্জি আমার বাবা।'

ব্যাগ এবং সুটকেশ নামিয়ে প্রতি-নমস্কার জানালো সুজাতা। বলল, 'নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দিস সিটি ইজ টোটালি আননোন টু মি। কিভাবে আপনাদের বাড়ি পৌঁছুব, একটু আগে তা-ই ভাবছিলাম।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, 'মুখার্জি আঙ্কলের এয়ারপোর্টে আসার কথা ছিল। এলেন না যে?'

'বাবার ব্লাড প্রেসারটা কাল রাত্তিরে হঠাৎ বেড়ে গেছে। ডাক্তার চব্বিশ ঘন্টা বিছানায় কনফাইনড থাকতে বলেছেন। তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।' অনিমেষ বলতে লাগল, 'চলে তো এলাম। কিন্তু কিভাবে আপনাকে খুঁজে বার করব,সেটাই ছিল একটা প্রবলেম। যতদূর মনে পড়ছে, ছেলেবেলায় দিল্লিতে আপনাকে দেখেছি। বাট নাউ ইউ আর আ লেডি। হঠাৎ দেখলে

চেনা অসম্ভব।'

সুজাতা জানালো, সেও অনিমেষকে অল্প বয়সে দেখেছে। কিন্তু অতদিন আগের একটা ছোট ছেলের চেহারার কোনোরকম ইম্প্রেশনই তার স্মৃতিতে নেই। নিজে পরিচয় না দিলে অনিমেষকে সে চিনতেই পারত

অনিমেষ হাসল, 'সময় কাউকে কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেয়?' বলেই তার মনে হল, দারুণ সাজানো দার্শনিক টাইপের একটা কথা বলে ফেলেছে।

সুজাতাও হাসল, 'রাইট। সময় সবাইকেই বদলে দেয়। তাই আমার জন্যে আপনাকে এনকোয়ারি কাউন্টারের হেল্প নিতে হল।'

'এ ছাড়া উপায় কী।' সুজাতাব ব্যাগ এবং সুটকেশটা দ্রুত তুলে নিয়ে অনিমেষ বলল, 'চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

সুজাতা বিব্রত মুখে বলল, 'এ কী করছেন! প্লিজ ওগুলো আমাকে দিন।'

অনিমেষ সুটকেশ টুটকেশ ছাড়ল না। বলল, 'ঠিক আছে। আপনি আসুন তো।'

সুজাতা বলল, 'আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে।'

'এত সামান্য কারণে খারাপ লাগার কোনো মানে হয়!' বলেই লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল অনিমেষ। তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল সুজাতা।

মিনিট কয়েক পরে দেখা গেল, ওরা টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের বাইরে কার পার্কিং জোনে চলে এসেছে। একটা ঝকঝকে নতুন টোয়োটা গাড়ির ব্যাক সিটে সুজাতার মালপত্র রেখে ফ্রন্ট সিটের দরজা খুলে দিল অনিমেষ। বলল, 'বসুন—'

সুজাতা বসলে অনিমেষ ঘুরে গিয়ে তার পাশে বসে চাবি ঘুরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

॥ দুই ॥

আরব সাগরের পার থেকে বার শ মাইল দূরের এই শহরে সুজাতাকে যে আসতে হয়েছে সেটা অকারণে নয়। তার পেছনে একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। সে কথা বলার আগে শিবনাথ মুখার্জি এবং মাধবরাও কুলকার্ণির পারিবারিক ইতিহাস জানা দরকার। মাধবরাও সুজাতার বাবা।

শিবনাথ এবং মাধবরাও ছিলেন কলিগ। দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব তাঁদের। ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে তাঁরা প্রায় একই সময়ে কেরানি হিসাবে ঢুকেছিলেন। মাধবরাও অম্বরনাথে বছর তিন চারেক কাটিয়ে চলে গিয়েছিলেন দিল্লি। শিবনাথকেও কয়েকটা বছর কলকাতায় রেখে দিল্লিতে ট্রান্সফার করা হয়েছিল।

শহরের দুই প্রান্তে ছিল তাঁদের অফিস। তবে থাকতেন পাশাপাশি কোয়ার্টারে। ফলে সম্পর্কটা গাঢ় হয়ে উঠেছিল এবং এখনও সেটা অটুটই রয়েছে।

দু'জনেই প্রোমোশন পেয়ে পেয়ে তাঁদের মিনিস্ট্রির দুই ডিপার্টমেণ্টে ডেপুটি সেক্রেটারি পর্যন্ত উঠেছিলেন। চাকবি জীবনের সেটাই ছিল তাঁদের চূড়ান্ত হাইট। সেখান থেকেই বছর সাতেক আগে রিটায়ার করে মাধবরাও চলে গেছেন বম্বেতে, তাঁদের বান্দ্রার বাড়িতে। শিবনাথ চলে এসেছেন কলকাতায়।

শিবনাথের ফ্যামিলি মাঝারি মাপের। স্বামী-স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে।

প্রথম কয়েকটা বছর বাদ দিলে চাকরি জীবনে শিবনাথ সপরিবারে দিল্লিতে থাকেন নি। একজন রান্নার লোক নিয়ে দিল্লির কোয়ার্টারে একাই থাকতেন। তাঁর নিঃসঙ্গ দিল্লিবাসের কারণ স্ত্রীর স্বাস্থ্য। ওখানকার জলহাওয়া একেবারেই সহ্য হত না স্নেহসুধার। দিন কয়েক থাকলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যেত। প্রথম ক'বছর ধুঁকে ধুঁকে কাটাবার পর নিরুপায় হয়েই শিবনাথ বেহালায় তাঁদের পৈতৃক বাড়িতে স্নেহসুধা এবং ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছুটিছাটায় তিনি বাড়ি আসতেন। তখনও কলকাতায় তাঁদের জয়েণ্ট ফ্যামিলি। দাদারা ছিলেন মাথার ওপরে। তাঁদের দায়িত্ববোধ ছিল

যথেষ্ট। স্নেহসুধা এবং ছেলেমেয়েদের কোনোদিনই অযত্ন হয়নি।

রিটায়ারমেন্টের পর শিবনাথ যখন কলকাতায় এলেন তখন বেহালার বাড়িতে লোকজন অনেক বেড়ে গেছে। চার দাদার মধ্যে দু'জন মারা গেলেও ভাইপোদের বিয়ে হয়েছে, তাদের বউ এবং বাচ্চাকাচ্চায় বাড়ি একেবারে জমজমাট। এত মানুষের জায়গাও হচ্ছিল না, তাই ছাদে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দিয়ে খানকতক ঘর তুলে নিতে হয়েছিল। তা ছাড়া যেটা বড় ব্যাপার তাঁদের জয়েন্ট ফ্যামিলির ফ্রেম তখন ভাঙতে শুরু করেছে। ভাইপোদের কেউ কেউ চাকরি বাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। বাকি যারা ছিল তাদের ধরনধারণ অন্যরকম। নিজেদের ছেলে-বউর বাইরে তারা আর কিছু ভাবতে চাইত না। হয়তো আত্মকেন্দ্রিক হওয়াই একালের নিয়ম। ফলে অতি দ্রুত প্রাচীন কালের বিশাল ডাইনোসরের মতো তাঁদের যৌথ পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল।

বাড়ির আবহাওয়া অসহ্য লেগেছিল শিবনাথের। রিটায়ারমেন্টের পর যা টাকা পয়সা পেয়েছিলেন তা দিয়ে যোধপুর পার্কে একটি বাড়ি করে চলে এসেছিলেন।

এত দিনে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েছে। বড় ছেলে অশোক একটা মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির সিনিয়র একজিকিউটিভ। ক'বছর আগে তার বিয়েও দিয়েছেন। পুত্রবধূ মঞ্জিরা ভাল নাচে, মাঝে মাঝে রবীন্দ্রসদনে বা কলামন্দিরে ড্যান্স প্রোগ্রামও করে। মঞ্জিরার একটা নাচের স্কুল আছে। ওদের একটা মাত্র ছেলে। অশোকের পর শ্রাবণী। যাদবপুর থেকে কম্পারেটিভে এম. এ পাশ করার পর তার বিয়ে দিয়েছেন শিবনাথ। জামাইয়ের কন্ট্রাক্টরি ফার্ম। শ্রাবণীর এখনও ছেলেমেয়ে হয় নি।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবার ছোট অনিমেষ। ম্যানেজমেণ্ট কোর্স কমপ্লিট করে একটা বড় কোম্পানিতে বড় পোস্টে রয়েছে। আমেরিকা বা ওয়েস্ট জার্মানিতে কয়েকটা বছর কাটিয়ে আসার ইচ্ছা। কোম্পানি যে কোনো দিন তাকে পাঠিয়ে দিতে পারে। অনিমেষের এখনও বিয়ে হয়নি।

বাইরে থেকে দেখলে শিবনাথকে একজন সুখী এবং সফল মানুষ মনে হতে পারে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বিয়ে দিয়েছেন, সবাই প্রতিষ্ঠিত। কোনো কর্তব্যই তিনি অবহেলা করেন নি। এমন কি স্ত্রীর নামে

যোধপুর পার্কে বাড়িও করে দিয়েছেন। জীবনের দীর্ঘ ম্যারাথন দৌড় শেষ করে এখন তাঁর বিন্দুমাত্র অতৃপ্তি থাকার কথা নয়। তবু সর্বক্ষণ তাঁর বুকের ভেতর কোথায় যেন ঘুণপোকা শিরা কেটে যাচ্ছে। শিবনাথের ব্লাডপ্রেসার, সুগার এবং বছর দুই আগে মাঝারি রকমের একটা স্ট্রোকের যথেষ্ট কারণই রয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে।

এবার মাধবরাও কুলকার্ণি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। স্ত্রী প্রভাবাঈ এবং দুই মেয়ে নলিনী আর সুজাতাকে নিয়ে তাঁর ছোট সংসার। সপরিবারে তাঁরা দিল্লিতেই থাকতেন।

মাধবরাও খুবই আমুদে মানুষ। সারাক্ষণ হৈচৈ করে আনন্দে থাকতে ভালবাসতেন। তবে হুট করে সবার সঙ্গে মিশতে পারতেন না। নানা ব্যাপারে দিল্লি শহরের কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর আলাপ পরিচয়। কিন্তু বন্ধু বাছাইয়ের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত খুঁতখুঁতে, খুবই সিলেকটিভ। পছন্দমতো না হলে তিনি কারো দিকেই বেশিদূর এগুতেন না। নিছক ভদ্রতাটুকুই বজায় রাখতেন।

সহকর্মী এবং প্রতিবেশী হিসেবে শিবনাথকে খুবই ভাল লেগে গিয়েছিল মাধবরাওয়ের। দু'জনের মানসিক গড়নও প্রায় একই রকম। প্রতি উইক-এণ্ডেই শিবনাথকে তুলে নিয়ে কুতুব কি যমুনার পারে পিকনিক করতে চলে যেতেন মাধবরাওরা। একটু বেশি ছুটি পেলে যেতেন জয়পুর বা অমৃতসরের দিকে। তখনও দেশভাগ হয়নি। একবার তাঁরা লাহোরেও গিয়েছিলেন।

শুধু হুল্লোড় পিকনিক বা মজাই না, পারিবারিক সব ব্যাপারেই তাঁরা পরস্পরের পরামর্শ নিতেন। সুখে দুঃখে দু'জনে ছিলেন অভিন্ন।

প্রভাবাঈও স্বামীর বন্ধুটিকে খুবই যত্ন করতেন। বেশির ভাগ দিনই তাঁর কিচেন থেকে শিবনাথের জন্য বাটি ভর্তি মাংস বা ভাল মারাঠি রান্নার দু-চারটে পদ আসত। মাঝে মাঝেই এসে কাজের লোকটিকে দিয়ে ঘরটর পরিষ্কার করাতেন। এক নিঃসঙ্গ দিল্লিবাসী পুরুষের জীবন নানা দিক থেকেই মাধুর্যে ভরে দিয়েছিলেন প্রভাবাঈ।

ওদের দুই মেয়ে নলিনী আর সুজাতা সিমলায় কনভেন্টে পড়ত। ছুটি পড়লেই চলে আসত মা-বাবার কাছে। বাবার মতোই শিবনাথ আঙ্কলের

কাছে তাদের অজস্র আবদার।

দুই বোনই লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট। কনভেন্টের পড়া শেষ করে দু'জনেই দিল্লিতে এসে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ইংরেজিতে এম. এ কমপ্লিট করার পর নলিনী চলে যায় অক্সফোর্ডে। সেখানে রিসার্চ করতে করতে একজন অধ্যাপককে বিয়ে করে ইংল্যাণ্ডেই সেটেল করেছে। নলিনী এখন বৃটিশ সিটিজেন।

সুজাতা ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে চলে গিয়েছিল আমেরিকায়। ওখানকার একটা ইউনিভার্সিটিতে থিসিস কমপ্লিট করে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছে।

এদিকে রিটায়ারমেন্টের পর মাধবরাওরা বম্বে চলে গেছেন। তাঁর আর কোনো ভাই বোন নেই। যৌথ পরিবারের হাঙ্গামা তাঁকে পোয়াতে হয় নি। বাপ-মায়ের এক ছেলে হওয়ায় বম্বের পৈতৃক বাড়িটা তিনি একাই পেয়েছেন। সেখানে প্রভাবাঈ আর তিনি থাকেন। মেয়েরা দু-এক বছর পর পর তাঁদের দেখে যায়।

বারশ মাইল দূরে থাকলেও শিবনাথ এবং মাধবরাওয়ের বন্ধুত্ব এখনও অটুটই রয়েছে। শরীর ভেঙে যাওয়ায় শিবনাথের পক্ষে বম্বে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। তবে মাধবরাও বার তিনেক কলকাতায় এসে মাসখানেক করে থেকে গেছেন।

দুই বন্ধু পনের দিনে একটা করে চিঠি লিখবেনই। এখনও পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক বা শারীরিক ব্যাপারে তাঁরা পরস্পরের পরামর্শ নেন। খুব জরুরি হলে ট্রাঙ্ক কলে কথা বলেন।

এবার সুজাতার কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যেতে পারে।

আমেরিকায় যে ব্যাপারে সে রিসার্চ করেছে সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং। থার্ড ওয়ার্ল্ডের গরিব দেশগুলোর স্লাম ডোয়েলার বা বস্তিবাসীদের আর্থিক অবস্থা ছিল তার রিসার্চের বিষয়। এ সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। আমেরিকার নানা লাইব্রেরিতে গিয়ে বিভিন্ন বই এবং জার্নাল থেকে তথ্য এবং স্ট্যাটিসটিকস জোগাড় করে তার ওপর থিসিসটা দাঁড় করিয়েছিল সুজাতা। আমেরিকার এক প্রকাশক রিসার্চ-ওয়ার্কটি ছেপে বাজারে বার করেছে। ওখানকার এবং ইওরোপের অনেক পত্রপত্রিকায়

বইটির দারুণ প্রশংসা করে রিভিউ বেরিয়েছে। এত কম বয়সের আর কোনো ভারতীয় স্কলার এমন একটা মারাত্মক বিষয়ে রিসার্চ করে ইওরোপ-আমেরিকায় হৈচৈ ফেলতে পারেনি। এ নিয়ে মনে মনে সুজাতার চাপা একটু অহঙ্কার ছিল।

প্রথম বইটির এই অভাবিত 'সাকসেস' সুজাতার উৎসাহ এবং এনার্জি যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে ঠিকই করে ফেলেছিল, থার্ড ওয়ার্ল্ডের, বিশেষ একটা জায়গা ধরে সেখানকার অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নতুন বইটা লিখবে। সে জানে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র মানুষ সম্পর্কে ইওরোপ-আমেরিকার সীমাহীন আগ্রহ। গরিব প্রতিবেশী সম্বন্ধে পয়সাওলা বড়লোকের যে মনোভাব, এশিয়া আফ্রিকার না খেতে পাওয়া মানুষ সম্বন্ধেও ইওরোপ-আমেরিকার অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির মনোভাব অবিকল সেইরকম। সন্ধেবেলা কার্পেটে-মোড়া লিভিং রুমে হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে তারা বলাবলি করে, 'অমুক বইটা পড়েছ! হরিবল! এশিয়া আফ্রিকার মানুষ কিভাবে বেঁচে আছে, ভাবা যায় না! একেবারে স্টারভেশন পয়েন্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।' আরেকজন হয়তো বলে, 'এই জন্যেই তো আমেরিকা আর ইওরোপে এশিয়ান ইমিগ্রান্টদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে। কয়েক বছরের মধ্যে দেখবে এই সব হাভাতেরা এখানেও প্রবলেম ক্রিয়েট করবে।' অন্য একজন মৌখিক সহানুভূতির সুরে বলে, 'উই শুড ডু সামথিং ফর দিজ স্টার্ভড হিউম্যান বিয়িংস।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুজাতার আমেরিকান প্রকাশকও একটা নতুন বই লিখে দেবার জন্য বার বার বলছে। বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের কাছ থেকেও তাগাদা এসেছে। কিন্তু থার্ড ওয়ার্ল্ডের কোন অঞ্চল বা জনগোষ্ঠি নিয়ে কাজ করবে, সেটা ঠিক করে উঠতে পারছিল না। লাইব্রেরিতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা প্রচুর বই বা ডকুমেন্ট ঘাঁটাঘাঁটি করেও পছন্দমতো সাবজেক্ট খুঁজে পায় নি।

এই ভাবে সুজাতা যখন হাতড়ে বেড়াচ্ছে সেই সময় এক ভারতীয় সহকর্মী প্রাইভেট শোয়ে তাকে একটা ডকুমেন্টারি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। একজন আমেরিকান টি. ভি ফিল্মমেকার কলকাতায় কয়েক মাস কাটিয়ে ছবিটা তুলে এনেছে। ডকুমেন্টারিটার বিষয় কলকাতার বস্তি।

তিরিশ মিনিটের এই ছোট তথ্যচিত্রটি দেখতে দেখতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সুজাতার। থার্ড ওয়ার্ল্ডের স্লাম ডোয়েলারদের অর্থনৈতিক যে সমস্যা নিয়ে সে বই লিখেছে, কলকাতার বস্তিবাসীদের সমস্যা তার একশ গুণ ভয়াবহ।

ছবির সঙ্গে সঙ্গে কমেন্টারিও চলছিল। তাতে জানানো হয়েছে থার্ড ওয়ার্ল্ডের এ এমন এক শহব যেখানে শতকরা পঁয়তাল্লিশ জনই বস্তিবাসী। গোটা শহরটাই একটা বিশাল আকারের স্লাম।

দারিদ্র্যের কোন অতল স্তরে এই সব মানুষ নেমে গেছে ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়। আর্থিক বিপর্যয়ই শুধু নয়, সমস্ত রকম হিউম্যান ভ্যালুজ বা মানবিক মূল্যবোধও একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে এই বস্তিগুলোতে।

অথচ এখানে মানুষ বাড়ছে হুড় হুড় করে। 'পপুলেশন এক্সপ্লোসান' কাকে বলে দেখতে হলে কলকাতাব বস্তিগুলোতে আসতে হবে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলো থেকে জলস্রোতের মতো মানুষ ঢুকে পড়ছে এখানে। তা ছাড়া দেশভাগের পর লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু তো এসেছেই।

মানুষ যেভাবে বাড়ছে সেভাবে কলকারখানা বা কাজকর্মের সুযোগ কিছুই বাড়েনি। অর্থনৈতিক 'গ্রোথ' একেবারেই থেমে গেছে এ শহরে। এখন এখানে পুরোপুরি স্ট্যাগনেশন চলছে। গলা টিপে এ শহরকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে যেন।

অথচ একসময় কলকাতা ছিল বৃটিশ ইণ্ডিয়ার ক্যাপিটাল। ভারতবর্ষের ফার্স্ট সিটি। ব্যবসা, বাণিজ্য, ইণ্ডাস্ট্রি, এডুকেশন, কালচারাল অ্যাকটিভিটি— সব কিছুতেই এই শহর ছিল নাম্বার ওয়ান। এখন নামতে নামতে কোথায় পৌঁছে গেছে, ভাবা যায় না।

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক সমস্যা কত মারাত্মক হতে পারে তার নমুনা হিসাবে কলকাতা মেট্রোপলিসের বস্তিগুলোকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। সব দিক থেকেই মনুষ্যত্বের এমন ক্ষয় এবং ভয়াবহ পরিণতি পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

ডকুমেন্টারিটা দেখতে দেখতে সুজাতা ঠিক করে ফেলেছিল, তার পরবর্তী রিসার্চের বিষয় হবে কলকাতার বস্তিবাসীরা। শুধু অর্থনৈতিক

দিক থেকে নয়, সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকেও সে এই সব মানুষের জৈবিক সমস্যাগুলোকে ধরতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু কলকাতা থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে বসে বইপত্র ঘেঁটে নোট নিয়ে বা ডকুমেন্টারি দেখে এদের সমস্যার ভয়াবহতা ঠিকমতো বোঝা যাবে না। সে জন্য নিজস্ব অভিজ্ঞতা দরকার। আর এই অভিজ্ঞতার কারণেই তাকে কলকাতায় যেতে হবে।

কলকাতায় তো যাবে কিন্তু থাকবে কোথায়? তখনই শিবনাথের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তার। আর দেরি না করে সেই মুহূর্তেই তাঁকে চিঠি লিখেছিল সুজাতা। জানিয়েছিল; যেমন করে হোক, একটা বস্তিতে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তার ইচ্ছা মাঝে মাঝে টুরিস্ট হিসেবে গিয়ে নয়, বেশ কিছু দিন বস্তির লোকজনের সঙ্গে কাটিয়ে সে তাদের জীবনের সব দিকগুলোকে ধরতে চেষ্টা করবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই শিবনাথের উত্তর এসে গিয়েছিল। কলকাতার বস্তির একটা ভীতিকর ছবি এঁকে তিনি জানিয়েছিলেন, ওখানে বাইরে থেকে গিয়ে কারো পক্ষেই, বিশেষ করে সুজাতার মতো একটি তরুণীর পক্ষে থাকা অসম্ভব ব্যাপার। তার নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে? সে কলকাতায় আসুক, এ খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু কোনোভাবেই তিনি তাকে বস্তিতে থাকতে দেবেন না। মাধবরাওয়ের মেয়ে তাঁরও মেয়ে। সুজাতা সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

চিঠিটা পড়ে সুজাতার হতাশ হবারই কথা। কিন্তু সে আশা ছাড়ে নি। আবার চিঠি লিখেছিল।

বার কয়েক লেখালিখির পর শিবনাথ জানিয়েছিলেন, সুজাতা কলকাতায় চলে আসুক, তারপর ভেবেচিন্তে কী ব্যবস্থা করা যায়, দেখা যাবে।

শিবনাথের শেষ চিঠিটা পাবার পর আমেরিকা থেকে বম্বেতে মা-বাবার কাছে চলে এসেছিল সুজাতা। সেখানে দিনকয়েক কাটিয়ে আজ কলকাতায় এল।

॥ তিন ॥

এতক্ষণে অনিমেষদের নতুন ঝকঝকে টোয়োটা গাড়িটা এয়ারপোর্ট পেছনে ফেলে ভি. আই. পি রোডে এসে পড়েছে।

সবে কার্তিকের শুরু। ঋতুর হিসেবে হেমন্ত। ক'দিন আগেই পুজো শেষ হয়েছে। কার্তিক পড়ে গেলেও শরৎ বিদায় নেবার নাম করছে না। আসলে কলকাতা ছেড়ে যাবার গা নেই তার। গোটা আকাশ জুড়ে আশ্বিনের মায়াবি স্মৃতি এখনও ছড়ানো রয়েছে। ঝকমকে নীলাকাশে তুলোর পাহাড় হয়ে অলস সাদা মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। আর উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।

এখন সাড়ে ন'টার মতো বাজে। অঢেল সোনালি রোদে ভি. আই. পি রোডের দু'ধারের গাছপালা বাড়িঘর যেন ভেসে যাচ্ছে। বাঁ দিকে সরু খালের ওপাশে সল্ট লেক সিটি যেন কোন জাপানি আর্টিস্টের আঁকা এক অলৌকিক অয়েল পেন্টিং।

নতুন জায়গা দেখার আগ্রহে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে সুজাতা। আর ড্রাইভ করতে করতে মাঝে মাঝেই তাকে লক্ষ করছে অনিমেষ। এয়ারপোর্টে সুজাতাকে প্রথম দেখার সময় তার চোখে বিস্ময় এবং কৌতূহল ছিল, এখনও তা মুছে যায় নি। হঠাৎ আস্তে করে সে ডাকল, 'মিস কুলকার্ণি—'

সুজাতা মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

অনিমেষ বলল, 'একটা কথা যত ভাবছি ততই অবাক হচ্ছি।'

সুজাতা বলল, 'কী কথা?'

'পৃথিবীতে এত সাবজেক্ট থাকতে কলকাতার স্লাম নিয়ে আপনার বই লেখার ইচ্ছা হল কেন?'

'কলকাতার বস্তিতে মনুষ্যত্বের ওয়েস্টেজ যতটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের আর কোথাও ততটা হচ্ছে বলে আমার জানা নেই। নিজের দেশেরই একটা শহরে এ রকম একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটছে, সে সম্বন্ধে একজন সচেতন মানুষ হিসেবে আমার আগ্রহ থাকবে না?'

'কিন্তু যারা সাব হিউম্যান স্টেজে চলে গেছে তাদের নিয়ে রিসার্চ করে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। ডার্ক সাইড নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে লাভ কি? জীবনের অনেক ব্রাইট দিক আছে।'

সুজাতা বলল, 'তা হয়তো আছে। তবে এদের সম্বন্ধেই আমার ইন্টারেস্ট বেশি।'

অনিমেষ উত্তর দিল না।

খানিকটা সময় চুপচাপ কাটল। গাড়িটা ততক্ষণে লেকটাউন ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে। উল্টো দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাইভেট কার, মিনিবাস, এয়ার লাইনসের গাড়ি প্রচণ্ড স্পিডে এয়ারপোর্টে চলেছে।

অনিমেষ স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে উইণ্ডস্ক্রিনের বাইরে তাকিয়ে ছিল। আবার সে সুজাতার দিকে মুখ ফেরাল, 'বাবাকে আপনি লিখেছেন, বেশ কিছুদিন কলকাতার স্লামে থাকতে চান। সত্যিই থাকবেন?'

'নিশ্চয়ই। দূর থেকে ভাসা ভাসা আইডিয়া নিয়ে আমি এ কাজ করতে চাই না।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'কলকাতার বস্তি সম্বন্ধে কোনোরকম ধারণা আছে?'

'বইটই পড়ে আর একজন আমেরিকান ফিল্মমেকারের ডকুমেন্টারি দেখে যেটুকু ধারণা কার যায় সেটুকুই আছে। তার বেশি কিছু নয়।'

'ইটস হেল মিস কুলকার্ণি। পৃথিবীতে নরক যদি কোথাও থাকে তা এই কলকাতার বস্তিতে। ওখানকার বাতাসে পয়জন। এক সেকেণ্ডও ওখানে গিয়ে আপনি থাকতে পারবেন না।'

প্রায় এই জাতীয় কথাই শিবনাথ বার বার তাঁর চিঠিতে লিখেছেন। সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ইকোলজিক্যাল প্রবলেমের কথা বলছেন?'

অনিমেষ বলল, 'ওখানকার পরিবেশ তো জঘন্যই। মোস্ট আনহাইজিনিক। তবে আমি শুধু তার কথাই বলছি না।'

'তা হলে?'

'আমি ওখানকার মানুষজনের কথা বলছি। মোস্ট অফ দেম আর

ক্রিমিনালস। মস্তান, বুটলেগার, মাতাল, প্রস্টিটিউট, পিম্প আর ওয়াগন ব্রেকারে কলকাতার স্লাম থিকথিক করছে। সারাক্ষণ ওখানে বোমাবাজি, মারপিট, হল্লা, খিস্তি। ও সব জায়গায় পা দেওয়া মাত্র আপনার দমবন্ধ হয়ে আসবে।'

একটু ভেবে সুজাতা বলল, 'আপনি স্লাম এরিয়ায় কখনও গেছেন?'

'নেভার ইন মাই লাইফ।' অনিমেষ জোরে কাঁধ ঝাঁকাল, 'মেরে ফেললেও আমাকে ওই নরকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না।'

'কোনো দিন যান নি। তা হলে ওখানকার খবর জানলেন কী করে?'

'কি আশ্চর্য, জানব না! একই শহরে তো থাকি। রোজই খবরের কাগজে বস্তির ব্যাপার নিয়ে কিছু না কিছু বেরোয়। তাতেই জানতে পারি।'

সুজাতা উত্তর দিল না। অনিমেষ কয়েক পলক তাকে দেখল। তারপর উইণ্ডস্ক্রিনের বাইরে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'বস্তির অ্যাটমসফিয়ার কিরকম, সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আইডিয়া দিলাম। তবু ওখানে গিয়ে থাকবেন?'

সুজাতা অল্প হাসল। বলল, 'সেই জন্যেই তো কয়েক হাজার মাইল পেরিয়ে এসেছি। এখন আর ডিসিসন বদলানো সম্ভব নয়।'

অনিমেষ বুঝতে পারল, সুজাতাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে এক ইঞ্চি টলানো যাবে না। মেয়েটা বোধ হয় খুবই একগুঁয়ে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'এখানকার স্লাম ডোয়েলারদের এইট্টি পারসেন্টই বাঙালি। বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজটা না জানলে ওখানে গিয়ে খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে।'

এবার পরিষ্কার বাংলায় সুজাতা বলল, 'বাংলা ভাষাটা আমি একটু একটু জানি। কাজ চালিয়ে নিতে পারব বলে মনে হয়।' বলেই হেসে ফেলল।

উইণ্ডস্ক্রিনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল অনিমেষ।। তারপর বাংলাতেই বলল, 'আপনি বাংলা জানেন, আগে বলেন নি তো।'

'সুযোগ পেলাম কোথায়?'

একটু ভেবে অনিমেষ এবার বলল, 'আপনি তো কোনোদিন কলকাতায় আসেন নি। বাংলা শিখলেন কোত্থেকে?'

সুজাতা জানালো, দিল্লিতে তারা যেখানে থাকত, তার চার পাশে ছিল প্রচুর বাঙালি। বম্বেতেও তাই। এমন কি, আমেরিকাতেও তার সহকর্মীদের মধ্যে বেশ কিছু বাঙালি রয়েছে। ছেলেবেলা থেকে এদের সঙ্গে মিশে মিশে বাংলাটা মোটামুটি শিখে ফেলেছে সে। তবে বলার মধ্যে এখনও যেটুকু জড়তা আছে, কলকাতায় কিছুদিন থাকলে তাঁ-ও কেটে যাবে।

অনিমেষ আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। ফের সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল।

॥ চার ॥

যোধপুর পার্কের নিরিবিলি পাড়ায় অনিমেষদের দোতলা বাড়িটা খুবই ছিমছাম।

অনেকটা জায়গা জুড়ে কমপাউণ্ড, মাঝখানে বাড়িটা। চারদিকে প্রচুর গাছপালা। বেশির ভাগই ফুলের গাছ। তবে দু-চারটে ঝাউ, অর্কিড আর মাধবীলতাও চোখে পড়ে। এই সব লতা এবং গাছের গায়ে যত্ন আর পরিচর্যার ছাপ। এত গাছটাছের জন্য বাড়িটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন। সেটা ঘিরে রয়েছে চোখ-জুড়ানো স্নিগ্ধতা।

অনিমেষরা যখন এসে পৌঁছুল, দশটা বেজে গেছে।

দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনিমেষের মা স্নেহসুধা, দাদা অশোক আর বৌদি মঞ্জিরা রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। বোঝা যায়, সবাই সুজাতার জন্য অপেক্ষা করছে। তবে ওদের মধ্যে শিবনাথকে দেখা গেল না। খুব সম্ভব ডাক্তারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানবার জন্য তিনি বিছানা থেকে ওঠেন নি।

অনিমেষ এবং সুজাতা গাড়ি থেকে নামতেই অশোকরা খুব ব্যস্তভাবে নিচে নেমে এল। একটা কাজের লোক দৌড়ে এসে সুজাতার সুটকেশ টুটকেশ বার করে ওপরে নিয়ে গেল।

অশোক খুবই সুপুরুষ, ছ ফুটের মতো হাইট। বলল, 'ওয়েলকাম ওয়েলকাম।'

সুজাতা স্নিগ্ধ হাসল, 'থ্যাঙ্কস।'

অশোক অনিমেষের মতোই এবার বলল, ছোটবেলায় সে তাকে দু-একবার দিল্লিতে দেখেছে। সুজাতা জানালো সে-ও অশোককে দেখেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। টুকরো টুকরো কিছু কথার পর অশোক বলল, সুজাতার জন্য সে আজ বেরুতে দেরি করেছে। অফিসে জরুরি কাজ আছে। এখন না বেরুলেই নয়। রাত্তিরে ফিরে এসে ভাল করে গল্প করা যাবে।

সুজাতা বলল, 'নিশ্চয়ই।'

মঞ্জিরা এগিয়ে এসে বলল, 'আমাকেও একটু বেরুতে হবে মিস কুলকার্ণি। সন্ধের আগেই ফিরতে পারব। তখন আলাপ হবে। বাই —'

সে হাত নাড়ল। তাই সুজাতাকেও হাত নাড়তে হল।

যে গাড়িটায় করে অনিমেষরা এয়ারপোর্ট থেকে এসেছে, অশোক এবং মঞ্জিরা সেটার দিকে এগিয়ে গেল। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, অনিমেষরা ফিরলেই ওরা সেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

এতক্ষণ অশোকদের সঙ্গে কথা বলছিল, তাই স্নেহসুধাকে লক্ষ করেনি সুজাতা। এবার তার চোখ স্নেহসুধার দিকে ফিরল। এক পলক তাকিয়ে থাকল সে। তার পর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাংলায় বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই আন্টি।' বলেই ঝুঁকে স্নেহসুধার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

সুজাতার চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেলেন স্নেহসুধা। বললেন, 'এসো মা, ওপরে চল।'

ওধারে অশোকরা গাড়িতে উঠে পড়েছিল। স্টার্ট দিতে যাবে, সুজাতার শেষ কথাগুলো তার কানে এল। অনিমেষের মতোই অবাক বিস্ময়ে সে বলল, 'এ কী, বাংলা জানো নাকি?'

সুজাতা উত্তর দেবার আগে অনিমেষ বলে উঠল, 'খুব ভাল জানে দাদা।'

'ইটস আ রিয়্যাল সারপ্রাইজ। আচ্ছা, চলি সুজাতা। তুমি করে বললাম বলে কিছু মনে করো না।'

'মনে করব কেন? আপনি আমার চেয়ে বড় না?' বলে অনিমেষের দিকে ফিরল, 'এল্ডার ব্রাদারকে বেঙ্গলিতে যেন কী বলে?'

অনিমেষ বলে দিল। সুজাতা ফের অশোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি আমার দাদা হন। তুমি করে তো বলবেনই।'

অশোক আর অপেক্ষা করল না, গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

এদিকে সুজাতাকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে লাগলেন স্নেহসুধা আব অনিমেষ। উঠতে উঠতে সুজাতা অনিমেষকে বলল, 'আপনাকে বেরুতে হবে না?'

'না।' অনিমেষ ঘাড় কাত করল, 'আপনার জন্যে আজ সারাদিনের সব প্রোগ্রাম ক্যানসেল করে দিয়েছি।'

দোতলায় এসে স্নেহসুধা বললেন, 'চল, তোমার ঘরটা আগে দেখিয়ে

দিই। কত দূর থেকে আসছ, অনেক ধকল গেছে। আগে একটু বিশ্রাম নাও।'

সুজাতা বলল, 'বিশ্রাম পরে হবে। আগে আঙ্কলের সঙ্গে দেখা করব।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন স্নেহসুধা। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, এসো তা হলে।'

দোতলায় উঠেই প্রকাণ্ড লিভিং রুম। সেটার বাঁ ধারে পর পর খানতিনেক বেডরুম। বাড়ির সামনের দিকে যেমন ব্যালকনি রয়েছে, পেছনেও তা-ই। ওধারের ব্যালকনিটা আরো বড়।

স্নেহসুধা সুজাতাকে নিয়ে প্রথম বেডরুমটায় ঢুকলেন। অনিমেষও তাদের সঙ্গে এসেছে।

বিরাট ঘরটা চমৎকার করে সাজানো। ওয়ার্ডরোব, ড্রেসিং টেবল, আলমারি—সব ঝকঝক করছে। ঘরটার শেষ মাথায় জোড়া জানালার ধার ঘেষে প্রকাণ্ড খাটে শুয়ে আছেন শিবনাথ। পাশে ছোট নিচু তিন কোণা একটা টেবলে নানা ধরনের ওষুধের শিশি, ব্রাউন আর সাদা খামে ব্লাড এবং ই. সি. জি রিপোর্ট।

কাছে গিয়ে স্নেহসুধা বললেন, 'দেখ কে এসেছে—'

শিবনাথ হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতে যাবেন, সুজাতা উঠতে দিল না। বলল, 'না না, আপনি শুয়ে থাকুন।' তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে খাটের একপাশে বসে বলতে লাগল, 'শুনলাম আপনি অসুস্থ। এখন কেমন আছেন?'

'আগের থেকে কিছুটা বেটার। তবে বিছানা থেকে ওঠা একেবারে বারণ।' বলে, এয়ারপোর্টে যেতে না পারার জন্য খুবই আক্ষেপ করলেন শিবনাথ। আসবার সময় রাস্তায় কোনো রকম অসুবিধা হয়েছে কিনা, জিজ্ঞেস করলেন।

সুজাতা জানালো, বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি।

এবার শিবনাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাধবরাও, প্রভাবাঈ এবং নলিনীর যাবতীয় খবর নিলেন। তারপর বললেন, 'যাও, স্নান টান করে খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।'

শিবনাথের খাট থেকে উঠতে উঠতে দ্বিধান্বিতভাবে সুজাতা বলল,

'আপনি অসুস্থ, তবু একটু বিরক্ত করছি আঙ্কল।'

'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। আমি যে জন্যে এসেছি তার কি কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?'

'খানিকটা হয়েছে। এই তো সবে এলে, এত তাড়া কিসের? দু-চার দিন আমাদের শহরটা ঘুরেটুরে দেখ।'

সুজাতা বলল, 'আগে যে কাজের জন্যে এসেছি সেটা শেষ করে ফেলি। তারপর শহর দেখা তো আছেই। কাজটা শুরু করতে না পারলে একটা টেনশন থেকে যাবে আঙ্কল।'

একটু ভেবে শিবনাথ বললেন, 'আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'আলাদাভাবে স্লামগুলো দেখলেই হবে না। বস্তি তো এই শহরেরই একটা অংশ। পুরো কলকাতাকে না দেখলে বা না জানলে বস্তি সম্পর্কে পারফেক্ট ধারণা করতে পারবে না। এই বিশাল ক্যালকাটা মেট্রোপলিসকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে তবে তার বস্তিগুলোকে বুঝতে হবে। নইলে বোঝাটা হবে পারশিয়াল।'

সুজাতার মনে হল, কথাগুলো ঠিকই বলেছেন শিবনাথ। সে বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু মাত্র দু-চার দিন ঘুরে এত বড় শহরের কতটুকুই বা জানতে পারব?'

শিবনাথ বললেন, 'একেবারে না জানার চাইতে যতটুকু জানা যায় সেটাই লাভ। দেখবে এই জানাটা খুব কাজে দেবে।' অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সুজাতাকে শহরটা একটু দেখিয়ে দিস।'

'দেব।' অনিমেষ মাথা নাড়ল।

শিবনাথ এবার সুজাতাকে বলল, 'তোমার যে বইটা বেরিয়েছে তার কপি টপি কি সঙ্গে এনেছ?'

সুজাতা জানালো, 'এনেছি।'

'আমাকে একটা কপি দিও তো।'

'নিশ্চয়ই দেব।'

মুখ ফিরিয়ে শিবনাথ স্ত্রীকে বললেন, 'সুজাতার ঘর টর সব গুছিয়ে দিয়েছ তো?'

স্নেহসুধা বললেন, 'দিয়েছি।'

'ওকে নিয়ে যাও। দেখো, কোনোরকম অসুবিধা যেন না হয়।'

'ওর ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে না।' বলে সুজাতাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন স্নেহসুধা।

অনিমেষ বেরুতে যাচ্ছিল, শিবনাথ বললেন, 'পরিতোষ তো এখনও এল না! সেদিন বলল, দু-একদিনের ভেতর আসবে। লালাবাজারে আজই আবার ওকে ফোন করে দে। যত তাড়াতাড়ি পারে চলে আসে যেন। বলবি সুজাতা এসে গেছে।'

পরিতোষ শিবনাথের ভাগ্নে, কলকাতা পুলিশের মোটামুটি একজন বড় অফিসার। বস্তিটস্তিতে গিয়ে থাকতে হলে পুলিশের সাহায্য দরকার। কখন কী ঘটে যাবে আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। তাই পুলিশকে ছুঁয়ে রাখা ভাল। ক'দিন আগে সুজাতার জন্য শিবনাথ পরিতোষকে ফোন করেছিলেন। হয়তো কোনো জরুরি কাজে আটকে যাওয়ায় আসতে পারেনি।

অনিমেষ বলল, 'এক্ষুণি পরিতোষকে ফোন করছি।' বলে আর দাঁড়াল না।

॥ পাঁচ ॥

দোতলায় মাঝারি মাপের যে ঘরটা সুজাতাকে দেওয়া হয়েছে সেটার তিন দিক একেবারে খোলামেলা। দক্ষিণে বিরাট একটা পার্ক, পশ্চিমে এবং উত্তরে অ্যাসফাল্টে মোড়া চওড়া রাস্তা সোজা অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। এই তিনটে দিক কোনো দিন বন্ধ হবে না। বাইরে হাওয়া থাকলে আর দরজা জানালা খুলে রাখলে এই ঘরটায় সারাক্ষণ ঝড় বইতে থাকে। ফ্যান ট্যানের দরকার হয না।

ঘরটা পরিপাটি করে সাজিয়ে দিয়েছেন স্নেহসুধা। মেঝে কার্পেটে-মোড়া। একধারে সিঙ্গল-বেড খাটে নরম ধবধবে বিছানা। এছাড়া আছে সুদৃশ্য ওয়ার্ডরোব, টেলিফোন, আলমারি, এক কোণে ছোট রাইটিং টেবল এবং গদি মোড়া চেয়ার।

স্নান এবং খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল সুজাতা। দুপুরে এমনিতে ঘুমোবার অভ্যাস নেই কিন্তু শুয়ে থাকতে থাকতে কখন দু চোখ জুড়ে এসেছিল, তার মনে নেই।

একটু আগে ঘুম ভেঙেছে সুজাতার। বালিশে চিবুক ডুবিয়ে জানালার দিকে অলস চোখে তাকিয়ে আছে সে।

বাইরে বিকেল হয়ে আসছে। যতদূর চোখ যায়, হেমন্তের ঘন সোনালি রোদ সব কিছু আলতোভাবে জড়িয়ে রেখেছে যেন।

পার্কের রেনট্রি,দেবদারু আর ঝাউগাছগুলোকে অবেলার আলোয় অপার্থিব মনে হচ্ছে।

প্রচুর উল্টোপাল্টা হাওয়া দিচ্ছে। দরজা জানালার পর্দাগুলো এলোমেলো উড়ছে। নিচের বাগানে কোথায় যেন পাখি ডাকছে।

জানালার ফ্রেমে আটকানো এক টুকরো ছবির মতো কার্তিকের নীলাকাশ, সাদা মেঘ, গাছপালা, পার্ক ইত্যাদি দেখতে দেখতে খুব ভাল লাগছিল সুজাতার। কলকাতার সবটাই বস্তি নয়, এখানেও চোখ জুড়োবার মতো বিউটি স্পট রয়েছে।

হঠাৎ দরজার বাইরে থেকে অনিমেষের গলা ভেসে এল, 'মিস কুলকার্ণি—'

চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল সুজাতা। ঘরের দরজাটা যদিও খোলা রয়েছে, তবে পর্দা রয়েছে। অবশ্য আজ যা হাওয়া তাতে পর্দা থাকা না থাকা সমান। উড়ন্ত পর্দার ফাঁক দিয়ে সুজাতা অনিমেষকে দেখতে পেল। বলল, 'ভেতরে আসুন না—'

অনিমেষ ভেতরে গেল না, বাইরে থেকেই বলল, 'যদি আপত্তি না থাকে চলুন একটু ঘুরে আসি। অফিসে তো যাওয়া হল না। বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগছে না।'

সুজাতা জানালো, বেরুতে তার আপত্তি নেই। হঠাৎ ভেতরে ভেতরে নতুন এই শহর সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল অনুভব করল সে। কলকাতা সম্বন্ধে কত রকম কথাই সে শুনেছে। 'সিটি অফ প্রশেসনস,' 'সিটি অফ স্লামস,' 'এ ডুমড সিটি,' 'ডার্টিয়েস্ট সিটি ইন দা ওয়ার্ল্ড' ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সবের কোনোটাই কলকাতার মর্যাদা বা গৌরব বাড়ায় না। কলকাতা কতটা খারাপ, কতটা নোংরা, কতখানি 'ডুমড'—নিজের চোখে একবার দেখাই যাক না।

'তা হলে আপনি তৈরি হয়ে আসুন। আমি লিভিং রুমে আছি।'

সুজাতার পরনে এই মুহূর্তে রয়েছে হাউস কোট। দ্রুত বিছানা থেকে নেমে সুটকেশ খুলে শাড়িটাড়ি বার করে অ্যাটাচড বাথরুমে চলে গেল সে। কয়েক মিনিট পর পোশাক বদলে লিভিং রুমে এসে দেখল, অনিমেষ অপেক্ষা করছে। সে বলল, 'চলুন, যাওয়া যাক।'

মুগ্ধ চোখে একটুক্ষণ সুজাতার দিকে তাকিয়ে রইল অনিমেষ। তারপর ধড়মড় করে উঠে পড়ল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন—'

ওরা যখন একতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছে সেই সময় ছাদের দিক থেকে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় নেমে আসছেন স্নেহসুধা। তাঁর পরনে লালপাড় গরদের শাড়ি, কপালে ডগডগে সিঁদুরের টিপ, হাতে পেতলের রেকাবিতে ফুল, সন্দেশ আর কিছু কাটা ফল। দেখেই বোঝায় যায় প্রসাদ।

দোতলায় পুজোর ঘর। সংসারের কাজকর্মের পর সারাটা দুপুর তাঁর ওখানেই কেটে যায়। এখন পুজোটুজো সেরে তিনি নেমে আসছেন।

সুজাতা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, 'আন্টির মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এখনও খাওয়া হয় নি।'

স্নেহসুধা অল্প হাসলেন, 'এই তো সবে পুজো শেষ হল। এবার খাব।'

'এত দেরি করে খেলে শরীর খারাপ হবে যে।'

'কিচ্ছু হবে না। রোজই তো এ সময়ে খাই, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।' বলেই চুপ করে কি একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা বেরুচ্ছ নাকি?'

সুজাতা বলল, 'হ্যাঁ আন্টি।'

স্নেহসুধার চোখ অনিমেষের দিকে ঘুরে গেল। পলকের জন্য তাঁর মুখ শক্ত হল। পরক্ষণেই আবার সুজাতার দিকে ফিরে বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরে এস। বেশি রাত করো না।'

সুজাতা স্নেহসুধার মুখের কাঠিন্যটুকু লক্ষ্য করেছিল। একটু অবাকই হল সে, তবে এ সম্পর্কে কিছু বলল না। শুধু জানালো, তাড়াতাড়িই ফিরে আসবে।

রাস্তায় এসে অনিমেষ বলল, 'দাদার গাড়ি দাদা নিয়ে চলে গেছে। এখন কিন্তু ট্যাকসিতেই বেড়াতে হবে।'

সুজাতা হাসল, 'আমার আপত্তি নেই। ট্যাক্সি কেন, বাসটাসেও ঘুরতে পারি।'

'ইমপসিবল। কলকাতার পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই।'

কথায় কথায় দু'জনে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে চলে এসেছিল। একটা ট্যাক্সিতে উঠে অনিমেষ ড্রাইভারকে বলল, 'আগে এসপ্ল্যানেড চলুন—'

সুজাতাকে ট্যাক্সিতে চড়াবার জন্য ভেতরে ভেতরে এক ধরনের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগছিল অনিমেষ। যেতে যেতে সে বলল, 'আজকের দিনটা একটু কষ্ট করুন। কাল থেকে দাদার গাড়িটা যদি পাওয়া যায় ভালই। তা না হলে অন্য ব্যবস্থা করব।'

'কী ব্যবস্থা?' সুজাতা অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল।

'ক'দিনের জন্য একটা ইমপোর্টেড কার ভাড়া করে নেব।'

বিব্রতভাবে সুজাতা বলল, 'প্লিজ না, আমার জন্য এসব করবেন না। ট্যাকসি যথেষ্ট কমফোর্টেবল।'

অনিমেষ বলল, 'এ ব্যাপারে আপনি ভাববেন না। বাবা কলকাতা

দেখাবার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। আমি যেভাবে নিয়ে যাব সেভাবে যাবেন। লাইক আ গুড গার্ল।

উত্তর না দিয়ে সুজাতা হাসল।

ট্যাকসিটা মাঝামাঝি স্পিডে ছুটছে। আমেরিকায় থাকতে কলকাতা সম্পর্কে যত রকম বদনাম সুজাতা শুনেছে একদিনেই তা প্রমাণ করার জন্য এ শহর যেন উঠে পড়ে লেগেছে। কোনো রাস্তাই আস্ত অক্ষত নেই, খোঁড়াখুঁড়ির ফলে চারদিকে অজস্র গর্ত। ফুটপাথগুলো পুরোপুরি হকারদের দখলে। সেখানে বাঁশ টিন দিয়ে তারা স্থায়ী ঝুপড়ি তুলে নিয়েছে। রাস্তার ধারে ধারে জঞ্জালের পাহাড়।

আমেরিকার যে শহর থেকে সুজাতা এসেছে সেখানে গাড়িটাড়ি কলকাতার দশ গুণ। কিন্তু ট্রাফিক সিস্টেম এত ভাল, ট্রাফিক নিয়ম এত নিখুঁত ভাবে মানা হয় যাতে কারো কোনো অসুবিধা হয় না। এখানে হুড়মুড় করে যে যার মতো গাড়ি ছোটাচ্ছে, মারাত্মক ভাবে ওভারটেক করছে। বাস মিনিবাস ইচ্ছামত এয়ারহর্ন বাজিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিচ্ছে। গল গল করে পোড়া মবিলের ধোঁয়া ছেড়ে কলকাতার বাতাসকে প্রতি মুহূর্তে আরো বিষাক্ত করে তুলছে। এই হাওয়া ফুসফুসে টেনে এখানকার মানুষ বেঁচে আছে কী করে? নাকি এখানকার সব লোকজন একবারে 'ইমিউন' হয়ে গেছে?

এয়ার পলিউশন, নয়েজ পলিউশন, ট্রাফিক জট এসব দেখে মনে হয়, এ শহর সারা পৃথিবী থেকে আলাদা বিচিত্র ভয়াবহ এক জায়গা।

গোটা তিনেক ছোট বড় প্রশেসানও তাদের পাশ দিয়ে 'দিতে হবে' 'মানতে হবে' করতে করতে বেরিয়ে গেল। একবার প্রায় আধঘন্টা প্রশেসানের জন্য তাদের ট্যাকসি রাস্তার মাঝখানে আটকে রইল।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর গঙ্গার ধারে ট্যাকসিটা ছেড়ে সুজাতাকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল অনিমেষ। কোণের দিকের একটা টেবলে মুখোমুখি বসে বলল, 'একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক।' টেবলের উপর ছাপানো মেনুকার্ড রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'আর কি আনাবো বলুন—'

সুজাতা বলল, 'আপনার জন্যে আনান। আমার জন্যে ওনলি কফি।'

'তাই কখনও হয়!' অনিমেষ সুজাতার কথা শুনল না। ওরা বসতেই একটা স্টুয়ার্ড দৌড়ে এসেছিল। তাকে ফ্রায়েড প্রন আর চিকেন স্যাণ্ডউইচের অর্ডার দিল সে। সেই সঙ্গে কফি।

আপত্তি করে লাভ নেই। কাজেই এবার চুপ করে রইল সুজাতা। কিছুক্ষণের ভেতর খাবার টাবার এসে গেল।

খেতে খেতে অনিমেষ বলল, 'একটা কথা বলব?'

তার চোখের দিকে তাকিয়ে সুজাতা বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'মিস কুলকার্ণি করে বলতে খারাপ লাগছে। আমি কিন্তু এখন থেকে শুধু সুজাতা বলব। আর আপনি নয়, স্রেফ তুমি। নইলে পুরোপুরি ফ্রি হতে পারছি না।' বলে অনিমেষ অল্প হাসল।

তার মনোভাবটা দ্রুত বুঝে নিয়ে সুজাতা বলল, 'আই ডোন্ট মাইণ্ড। আমিও অনিমেষ বলব আর আপনি বাদ দিয়ে তুমি। ঠিক আছে?'

অনিমেষ আস্তে মাথা নাড়ল, তার দু চোখে হাসি চিকচিক করতে লাগল।

ওরা যেখানে বসেছে, তার পর থেকেই গঙ্গা। বর্ষার জলে সেই যে নদীটা ভরে গিয়েছিল, এখনও ভরাই আছে। কার্তিকের শুরুতে এখন গঙ্গা খুবই স্থির এবং শান্ত। শেষ বিকেলের রোদ জলে আবীর গুলে দিয়েছে যেন। অনেকগুলো বিদেশি জাহাজ মাঝ গঙ্গায় নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব এখনও ডকে কোনো বার্থ পায় নি। মাঝে মাঝে পোর্ট ট্রাস্টের দু-একটা লঞ্চ বা ফেরিবোট কিংবা জেলে নৌকা জলপোকার মতো এধারে ওধারে ছোটাছুটি করছে। আকাশ জুড়ে পাখি উড়ছে অজস্র।

কাচের জানলার বাইরে কলকাতার সূর্যাস্ত হচ্ছে। দৃশ্যটা দেখার জন্য সুজাতা মুখ ফেরাতে যাবে, অনিমেষ হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি একটা ডিসিসন নিয়ে ফেললাম সুজাতা।'

'কী ডিসিসন?' সুজাতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'বাবা আমাকে তোমার গাইড করে দিয়েছেন। এক উইক অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তোমাকে কলকাতা দেখাব।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

এলোমেলো কিছু কথার পর অনিমেষ হঠাৎ বলল, 'একটা কথা বলতে

হেজিটেশন লাগছে। যদি সাহস দাও বলতে পারি।'

কী বলতে চায় অনিমেষ? পুরো দশ ঘণ্টাও হয় নি, সুজাতা কলকাতায় এসেছে। এর মধ্যে কতটা আর দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে সে? ভাল করে তাকে চেনেও না সুজাতা। সেই কোন ছেলেবেলায় দু-একবার দেখেছিল, পরিষ্কার মনেও নেই। আজ সকাল থেকে এই সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা সে তাকে দেখছে। এটুকু সময়ের মধ্যে অনিমেষ কী টাইপের ছেলে, বোঝা অসম্ভব। বেড়াতে আসার সময় স্নেহসুধার বিরক্ত মুখ লক্ষ করেছে সুজাতা। অনিমেষ সম্পর্কে তিনি যে খুশি নন, সেটা তাঁর মুখচোখের ভঙ্গি দেখে টের পাওয়া গেছে।

ফ্রি মিক্সিংয়ের দেশে একা একা কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছে সুজাতা। সেখানে ভালমন্দ বদমাস ডিসেণ্ট—কত ধরনের যুবকই তো দেখেছে। কাকে কতটা প্রশ্রয় দিতে হয় এবং কোথায় থামাতে হয়, সে জানে। শিবনাথ আঙ্কলের এই ছেলেটা কতদূর এগুতে চায়, দেখাই যাক না। কিছুটা মজার ভঙ্গিতে সুজাতা বলল, 'সাহস দিলাম। কী বলতে চাও বল—'

অনিমেষ বলল, 'একটা ব্যাপারে তোমার হেল্প চাই।'

'আমার পক্ষে সম্ভব হলে নিশ্চয়ই সাহায্য পাবে। কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা জানা দরকার।'

'অনেক দিন থেকেই আমার ইচ্ছা, আমেরিকায় যাই। চেষ্টাও করেছি কিন্তু যেতে পারি নি। তুমি কলকাতায় আসবে জানার পর থেকেই ভেবে রেখেছি, তোমাকে ধরব। আমার ফিউচার তোমার ওপর ডিপেণ্ড করছে।'

যাক, যা ভাবা গিয়েছিল তার ধার কাছ দিয়েও যায় নি অনিমেষ। তবে সে যা চাইছে সেটা নতুন কিছু নয়। ছুটিছাটায় যখনই সে বম্বেতে মা-বাবার কাছে আসে তখনই মাসতুতো পিসতুতো ভাইবোনেরা কিংবা চেনা অল্প-চেনা ছেলেমেয়ের ঝাঁক তাকে এসে ধরে। আমেরিকায় যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের স্টেটসে যাবার কেন যে এত ঝোঁক, সে বুঝে উঠতে পারে না।

সুজাতা বলল, 'আমার ধারণা, অ্যাভারেজ ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে তুমি অনেক ভাল চাকরি টাকরি কর।'

'তা হয়তো করি।'

'তবে আমেরিকায় যেতে চাইছ কেন?'

'ইটস আ ডার্টি হেল। কলকাতায় মানুষ থাকে! তোমাকে কিন্তু একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।'

একটু ভেবে সুজাতা বলল, 'দেখি কী করতে পারি।'

আরো কিছুক্ষণ আমেরিকা সম্পর্কে ঘ্যান ঘ্যান করল অনিমেষ। তারপর বিল মিটিয়ে সুজাতাকে নিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আবার ট্যাক্সি ধরল।

॥ ছয় ॥

অনিমেষরা যখন বাড়ি ফিরল তখন সন্ধে হয় হয়। রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এই সন্ধেবেলার বাতাসটা গায়ে লাগালে মনে হয়, আশ্বিন আর নেই, হেমন্ত শুরু হয়ে গেছে।

দোতলায় উঠতেই লিভিং রুমে স্নেহসুধাকে দেখতে পেল সুজাতা। পাঁচ ছ' বছরের একটা ফুটফুটে ছেলেকে তিনি দুধ খাওয়াচ্ছেন। সুজাতাকে দেখে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'এসে গেছ মা। তোমার কথাই খুব ভাবছিলাম। পরিতোষ তোমার জন্যে বসে আছে।'

সুজাতার মনে পড়ল, পরিতোষ শিবনাথের পুলিশ অফিসার ভাগ্নে। সে বলল, 'কোথায় তিনি?'

'তোমার আঙ্কলের ঘরে।'

সুজাতা আর দাঁড়াল না, বড় বড় পা ফেলে শিবনাথের ঘরে চলে গেল। তার পেছন পেছন অনিমেষও।

শিবনাথের খাটের পাশে একটা গদি মোড়া কুশনে বসে আছে পরিতোষ। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। লম্বাটে মুখ, ভাল হাইট। পেটানো কড়া ধাতের চেহারা। পরনে পুলিশ অফিসারের ইউনিফর্ম।

আলাপ টালাপ হবার পর পরিতোষ বলল, 'আপনি আমাদের খুব বিপদে ফেলে দিয়েছেন মিস কুলকার্ণি। আপনার মতো এমন পিকিউলিয়ার প্রস্তাব নিয়ে পুলিশের কাছে আগে আর কেউ আসে নি।'

পরিতোষ কী বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধা হল না সুজাতার। উত্তর না দিয়ে সে একটু হাসল।

পরিতোষ আবার বলল, 'যদিও সারপ্রাজিং তবু ক্যালকাটার বস্তিতে থাকার উদ্দেশ্যটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি।'

সুজাতা এবারও চুপ করে রইল।

পরিতোষ বলতে লাগল, 'একসময় আমিও সোসিওলজি আর ইকনমিকসের ছাত্র ছিলাম। সোসিও ইকনমিক প্রবলেম সম্পর্কে প্রচুর কৌতূহল ছিল। কিন্তু দিনের পর দিন চোর ছ্যাঁচোড় গুণ্ডা খুনী--হাজার

রকম অ্যান্টি-সোসাল ঘেঁটে ঘেঁটে আর কোনোদিকে নজর দিতে পারি না। তবে কেউ ভাল কাজ করলে আনন্দ হয়। আমার দিক থেকে সবরকম সাহায্য আপনি পাবেন।'

পরিতোষকে ভাল লেগে গেল সুজাতার। মানুষটা বেশ খোলামেলা। সে বলল, 'আমার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই।' শিবনাথকে দেখিয়ে পরিতোষ বলতে লাগল, 'মামার অর্ডার, ব্যবস্থা না করে উপায় আছে? বেলেঘাটার এক বস্তিতে আপনার থাকার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেছি।'

সুজাতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই শিবনাথ বলে উঠলেন, 'বস্তিতে গিয়ে থাকবে মেয়েটা, ওর সিকিউরিটির কী হবে?'

পরিতোষ বলল, 'সব ঠিক করে রেখেছি মামা। একা অল্প বয়সের মেয়ে গিয়ে ওই রকম অ্যাটমসফিয়ারে থাকবে, আমার রেসপনসিবিলিটি নেই?'

'কী ঠিক করেছিস?'

'ওই বস্তির সব চাইতে বড় মস্তানের সঙ্গে কথা বলেছি। স্লামের ভেতর সে মিস কুলকার্ণির প্রোটেকশনের ব্যাপারটা দেখবে। সে যখন দায়িত্ব নিয়েছে কারো সাহস নেই মিস কুলকার্ণির চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। একটু এদিক ওদিক হলে লাশ ফেলে দেবে।'

আগে থেকেই সুজাতার ব্যাপারে চাপা দুশ্চিন্তা এবং টেনসন ছিল শিবনাথের। হঠাৎ সেগুলো অনেক বেড়ে গেল। তিনি বললেন, 'মস্তান সুজাতাকে প্রোটেকসন দেবে! কী বলছিস পরিতোষ!'

পরিতোষ বলল, 'আমি যার কথা বলছি সেই ছোকরা ওই লোকালিটির টেরর। কিন্তু হি ইজ আ ডিফারেণ্ট টাইপ। আপনি ভাববেন না মামা। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন, মিস কুলকার্ণির গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগবে না।'

উদ্বিগ্ন মুখে এক পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনে যাচ্ছিল অনিমেষ। সে এবার মুখ খুলল, 'একটা মস্তানের ভরসায় এতবড় রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না পরিতোষদা।'

ঘাড় ফিরিয়ে অনিমেষের দিকে তাকাল পরিতোষ। বলল, 'এরকম

কথা তোরা যে বলবি, আমি জানতাম। তাই মিস কুলকার্ণির সিকিউরিটির জন্যে অন্য অ্যারেঞ্জমেণ্টও করেছি। ওখানকার থানার অফিসার-ইন-চার্জ সারাক্ষণ বস্তির ওপর লক্ষ রাখবে। তা ছাড়া সিভিল ড্রেসের পুলিশও ওয়াচ করবে।' বলতে বলতে সুজাতার দিকে তাকাল পরিতোষ, 'কি, এরপরও যদি ভয় করে তো বলুন। বস্তির ভেতর না হলে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে পুলিশ পোস্ট করে দেব।'

সুজাতা বলল, 'না না, পুলিশ পোস্টিংয়ের দরকার নেই। যা অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেছেন, যথেষ্ট। বস্তিতে মানুষই তো বাস করে। মানুষ সম্পর্কে আমি এখনও ডিসইলিউশানড হয়ে যাই নি।'

'গুড। আজ হচ্ছে বুধবার। আসছে রবিবার আপনি আমার সঙ্গে বেলেঘাটায় যেতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

'আমি সকালে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

শিবনাথ বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি কেন, ক'দিন যাক না। তারপর যাবে।'

সুজাতা বলল, 'না আঙ্কল, আপনি আপত্তি করবেন না। আজ থেকে শনিবার পর্যন্ত তো আছিই। কাজ হয়ে যাবার পর আবার ক'দিন এখানে থেকে আমেরিকায় ফিরব।'

শিবনাথ আর কিছু বললেন না এ বিষয়ে।

আরো খানিকক্ষণ গল্পটল্প করে পরিতোষ চলে গেল। তাকে এগিয়ে দেবার জন্য সুজাতা আর অনিমেষ সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এল। তারপর লিভিং রুম পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে সুজাতা লক্ষ করল, এখনও সেই ছোট ছেলেটার কাছে দুধ নিয়ে বসে আছেন স্নেহসুধা।

সুজাতা বলল, 'এখনও দুধ খাওয়ানো হয় নি আন্টি!'

স্নেহসুধা বললেন, 'আর বলো না মা, এক গেলাস দুধ খাওয়াতে কম করে তিন ঘণ্টা। এ ছেলেকে নিয়ে কি যে বিপদ!'

'বাচ্চাটা কে আন্টি?'

'টুটুল। আমার নাতি, অশোকের ছেলে।'

'স্কুলে গিয়েছিল। তোমরা বেড়াতে বেরুবার পর ফিরেছে।'

সুজাতা টুটুলের কাছে এগিয়ে গেল। তার চুলটুল নেড়ে, আলতো করে গাল টিপে একটু আদর করল। বলল, 'তুমি তো ভেরি গুড বয়। তাড়াতাড়ি দুধ খেয়ে নিলে অনেক গল্প বলব।'

টুটুল বড় বড় চোখে সুজাতাকে দেখছিল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

'আমি তোমার নতুন আন্টি।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়তে স্নেহসুধার দিকে তাকাল, 'আচ্ছা আন্টি—'

স্নেহসুধা মুখ তুললেন, 'কিছু বলবে?'

'অশোকদাদা আর বৌদিকে তো দেখছি না। ওঁরা এখনও ফেরেন নি?'

স্নেহসুধার মুখে কালচে ছায়া পড়ল। বিমর্ষ গলায় বললেন, 'না। কখন ফিরবে, ঠিক নেই। নিজেরা যা ইচ্ছা করে বেড়াবে! এই বাচ্চাকে নিয়ে আমার যত জ্বালা।'

সুজাতা কী বলবে ভেবে পেল না। সে বুঝতে পারছিল, অশোক এবং মঞ্জিরার ব্যাপারে স্নেহসুধার প্রচুর ক্ষোভ রয়েছে। অনুমান করল, টুটুলকে মায়ের কাছে ফেলে ওরা বেরিয়ে যায়, যখন খুশি ফেরে। বাচ্চাটার যাবতীয় ঝক্কি স্নেহসুধাকেই পোয়াতে হয়।

সুজাতা বিব্রত বোধ করছিল। কী উত্তর দেবে যখন বুঝে উঠতে পারছে না সেই সময় স্নেহসুধা বললেন, 'বাইরে থেকে ঘুরে এসেছ। যাও, শাড়িটাড়ি বদলে নাও। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সুজাতা বেঁচে গেল যেন। আর না দাঁড়িয়ে সোজা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল সে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় অনিমেষ, টুটুল এবং সুজাতাকে ডাইনিং রুমে ডেকে নিয়ে গেলেন স্নেহসুধা। অশোকরা তখনও ফেরে নি। সুজাতা তাদের জন্য আরেকটু অপেক্ষা করতে চাইল। স্নেহসুধা জানালেন, অশোকদের জন্য বসে থাকলে আজ রাতের খাওয়া না-ও হতে পারে। একটা, দুটো না তিনটে কখন তারা ফিরবে, কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয়।

অশোকদের প্রসঙ্গ উঠতেই আবহাওয়াটা যেন কিরকম হয়ে গেল। প্রায় চুপচাপ খাওয়া চুকিয়ে সবাই উঠে পড়ল।

স্নেহসুধা সুজাতাকে বললেন, 'রাত্তিরে যদি কিছু দরকার হয়, আমাকে ডেকো।' বলে টুটুলকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

অনিমেষ সুজাতাকে তার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে 'গুড নাইট' জানিয়ে একতলায় নেমে গেল। তার বেডরুম নিচে।

সুজাতা ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বিছানায় বসে রইল। তারপর একটা ইকনমিক উইকলি নিয়ে পা মুড়ে শুয়ে পড়ল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কখন তার দু চোখ জুড়ে এসেছিল খেয়াল নেই। উইকলিটা সাইড টেবলে রেখে বেড সুইচ নিভিয়ে দিল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন করে ঘুম নেমে এল।

কতক্ষণ পর সুজাতা জানে না, হঠাৎ কাদের চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভেঙে গেল তার। ধড়মড় করে উঠে বসতেই টের পেল, চিৎকারটা এই বাড়ি থেকেই আসছে। তাড়াতাড়ি বেড সুইচ টিপে আলো জ্বেলে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। তারপর দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়াতেই লিভিং রুমের দেয়ালে বড় জাপানি ওয়াল ক্লকটা চোখে পড়ল। এখন একটা বেজে বাইশ। পরক্ষণেই সুজাতা দেখতে পেল, বাড়ির কাজের লোকেরা প্রায় কাঁধে করে অশোককে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলে আনছে। আর অশোক হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে জড়ানো গলায় চিৎকার করছে, 'সানস অব বিচ, ব্লাডি বাস্টার্ডস —'

লিভিং রুমের একধারে চুপচাপ পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্নেহসুধা। তাঁর চোখের তারা স্থির, চোয়াল শক্ত, দাঁতে দাঁতে চাপা।

ঘুমের চোখে দৃশ্যটা দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিল সুজাতা। পরক্ষণে সে বুঝতে পারল, অশোক একেবারে ডেড ড্রাঙ্ক। প্রচণ্ড মদ খেয়েছে সে। দেখতে দেখতে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল সুজাতার। দরজার কাছ থেকে সরে আস্তে আস্তে জানালার সামনে গিয়ে গ্রিল ধরে দাঁড়াল।

নিচের রাস্তা একেবারে ফাঁকা। রাস্তায় মার্কারি ল্যাম্পগুলো সমানে জ্বলছে। গোটা কলকাতা এখন ঘুমের আরকে ডুবে আছে।

..পাঁচ মিনিটও কাটল না, একটা ঝকঝকে লিমুজিন এ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। তার ভেতর থেকে নেমে এল মঞ্জুরা। তার সঙ্গে টকটকে ফর্সা মধ্যবয়সী একটি লোকও নামল। তার পরনে নিখুঁত সাফারি সুট।

মঞ্জিরার হাত ধরে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল সে। বলল, 'গুড নাইট। সি ইউ—'

'গুড নাইট—'

দোতলার ঘর থেকে সুজাতা লক্ষ করল, মঞ্জিরা বা তার সঙ্গির স্বাভাবিকভাবে পা পড়ছে না। গলার স্বরও জড়ানো। প্রচুর পরিমাণে ড্রিংক যে ওরা করেছে, দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়।

লোকটা আবার গিয়ে লিমুজিনে ঢুকল। আর মঞ্জিরা প্রায় টলতে টলতে বাড়ির ভেতর চলে এল।

লোকটা কে? মঞ্জিরার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? সুজাতা ভাবল, দিন কয়েকের জন্য একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সে এই শহরে এসেছে। কে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছে, কার বউ কার সঙ্গে মাঝরাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ সব নিয়ে তার মাথা ঘামাবার আদৌ দরকার নেই। ভদ্রতা এবং ডিসেন্সির জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি কারো সঙ্গে মিশবে না সে বা কোনো ব্যাপারে কৌতূহল দেখাবে না। ভাবল বটে, কিন্তু ওই গোলমেলে প্রশ্ন দুটো প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মাথায় অনবরত পেরেক ঠুকতে লাগল।

ওদিকে লিভিং রুম থেকে অশোকের খিস্তিখেউড় এবং চিৎকার ভেসে আসছিল। হঠাৎ চেঁচামেচিটা কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

'ইউ বিচ, গেট আউট, গেট আউট।'

পরক্ষণেই মঞ্জিরার ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এল, 'শাট আপ স্ট্রিট ডগ। গলা দিয়ে টু-শব্দ বার করবে না।'

'একটা সোয়াইনের সঙ্গে মাঝরাত পর্যন্ত খচড়ামো করে এসে এখন বলছ, গলা দিয়ে আওয়াজ বার করবে না! হারামজাদি ফ্লার্ট কোথাকার!' টেনে টেনে বলতে লাগল অশোক।

'সোয়াইন!' হিংস্র গলায় চেঁচিয়ে উঠল মঞ্জিরা, 'কাল মিস্টার কাপুরকে বলব, তুমি তাকে সোয়াইন বলেছ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বলিস। আই ডোণ্ট কেয়ার এনিবডি ইন দিস ওয়ার্ল্ড।'

'এখন খুব তেজ ফলাচ্ছ। কাপুরের সামনে পড়লে তো ছুঁচোর মতো কুঁই কুঁই করো।' বলতে বলতে গলাটা কয়েক পদা চড়িয়ে দিল মঞ্জিরা, 'ওই সোয়াইনের কাছে কে আমাকে এগিয়ে দিয়েছিল? নিজের প্রোমোশনের

জন্যে কে আমাকে একটা নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছে? ইউ গাটার স্নাইপ, এখন স্বামীগিরি ফলাচ্ছ!'

'আই উইল কিল ইউ।'

নাকের ভেতর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটা আওয়াজ করল মঞ্জিরা, 'আমার গায়ে টাচ করতে হলে তোমাকে দশবার জন্ম নিতে হবে। এক জন্মে হবে না। স্ত্রীকে একটা জানোয়ারের কাছে বেচে দশজনকে সুপারসিড করে টপ একজিকিউটিভ হয়েছ। লজ্জা করে না কথা বলতে? তোমার গায়ে মানুষের রক্ত নেই?'

আচমকা শিবনাথের গলা ভেসে এল। উন্মাদের মতো তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'স্টপ ইট, স্টপ ইট। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, বস্তি নয়।'

চমকে পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসে বাইরে মুখ বাড়াল সুজাতা। শিবনাথ কখন যেন লিভিং রুমে এসে দাঁড়িয়েছেন। উত্তেজনায় রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শরীরের সব রক্ত চোখে গিয়ে জমেছে যেন। তাঁর ব্লাড প্রেসার যে হঠাৎ লাফ দিয়ে একটা বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছেছে সেটা টের পাওয়া যায়। মুখচোখ দেখে মনে হয়, এই মুহূর্তে একটা স্ট্রোক হয়ে যাবে।

শিবনাথের বিছানা থেকে ওঠা বারণ। তবু মাঝরাতে নিজের বাড়িতে একটা কদর্য নাটকের দৃশ্য দেখতে দেখতে তিনি আর শুয়ে থাকতে পারেন নি।

শিবনাথের ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার এবং কিছুদিন আগের স্ট্রোকের কারণটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারল সুজাতা।

ওদিকে শিবনাথের উন্মাদের মতো চেহারা দেখে চুপ করে গিয়েছিল অশোকরা। গলা দিয়ে একটি আওয়াজও আর বার না করে টলতে টলতে তারা ডান দিকের একটা ঘরে ঢুকে গেল।

সুজাতাও আর দাঁড়াল না। দরজা বন্ধ করে আলো টালো নিভিয়ে ফের শুয়ে পড়ল। কিন্তু এবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারল না।

আজ সকালে এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় অনিমেষ বলেছিল, কলকাতার বস্তিতে মানুষের ভ্যালুজ বলতে আর কিছু নেই, সব নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু একটা দিনের মধ্যেই সুজাতা টের পেয়ে গেছে, এখানকার পশ লোকালিটিতে ভদ্র শিক্ষিত পরিবারে ভ্যালুজ বলতে আর কিছু নেই।

॥ সাত ॥

পরের দিন থেকে সুজাতাকে নিয়ে সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াতে লাগল অনিমেষ।

সুজাতা আপত্তি করেছিল। তা সত্ত্বেও তার জন্য একটা নতুন মডেলের দামি প্রাইভেট কার ভাড়া করেছে অনিমেষ। দিনে পঞ্চাশ ষাট লিটার করে পেট্রোল পুড়িয়ে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান এরিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

ছেলেবেলায় কলকাতায় একবার মাত্র এসেছে সুজাতা। এ শহর তার কাছে অচেনা হলেও এখানকার ইতিহাস তার পড়া আছে। বৃটিশ ইণ্ডিয়ার ফার্স্ট সিটির চেহারা দেখতে দেখতে তার মন খারাপ হয়ে যেতে লাগল।

গাড়ির জানালা দিয়ে যেটুকু দেখা যায় তাতে মনে হল, মানুষ ছাড়া এখানে আর কিছুই বাড়ে নি। এ শহরের ইকনমিক গ্রোথ একেবারেই থেমে গেছে।

হকার, আবর্জনা, ঠেলা এবং রিকসার জন্য যেখানে গাড়িতে দশ মাইলের বেশি স্পিড তোলা যায় না সে শহরের পক্ষে বেশিদূর এগোনো সম্ভব নয়। পৃথিবীর অন্য সব সিটির ডেভলপমেণ্ট যখন ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে তখন কলকাতা ভাঙাচোরা রাস্তা, স্তূপাকার জঞ্জাল, মশা মাছির মধ্যে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে।

সেই ডকুমেণ্টারি ফিল্মের আমেরিকান ডাইরেক্টর তাকে জানিয়ে ছিল, ক্যালকাটা ইজ আ ডেড সিটি। ইটস লস্ট ফর এভার। কথাটা খুব সম্ভব মিথ্যে বলে নি সে।

ছোটাছুটির ফাঁকে ফাঁকে তাকে বাংলা সিনেমা দেখিয়েছে অনিমেষ। ভাবতে অবাক লাগে, আমেরিকার একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সত্যজিৎ রায়ের রেট্রোস্পেকটিভ দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সে। যে শহরে সত্যজিৎ এখনও কাজ করছেন সেখানে বাংলা ছবির স্ট্যাণ্ডার্ড কোথায় নেমে গেছে!

একটা নাটকও তাকে দেখতে নিয়ে গিয়েছিল অনিমেষ। ইন্টারভ্যালের আগেই উঠে চলে এসেছে সুজাতা। আর্ট একজিবিশন দেখতে গিয়েও

ভাল লাগে নি। ময়দানে রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে গিয়ে মনে হয়েছে মেকানিক্যাল কিছু কথা শুনছে।

হয়তো সে যা দেখছে তার চাইতে ভাল ফিল্ম, ভাল নাটক বা ভাল ছবি এখানে হচ্ছে। ময়দানের ঐ রাজনৈতিক নেতার চাইতে অনেকেই হয়তো ভাল বক্তৃতা দেয়। তবু যা সে দেখেছে বা শুনেছে তাতে চোখের সামনে কলকাতার যে প্রোফাইল ফুটে উঠেছে তা আদৌ উজ্জ্বল নয়।

ঘোরাঘুরি করতে করতে চোখের দৃষ্টি বা কথা বলার ভঙ্গি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল অনিমেষের। সে বলল, 'জানো সুজাতা, তোমার সম্বন্ধে আমার খুব ভয় ছিল।'

সুজাতা বলে, 'কেন? কিসের ভয়?'

'ভাবতাম আমেরিকা থেকে আসছ, ফেমাস রিসার্চ স্কলার। তোমার বই নিয়ে ইওরোপ আমেরিকা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। আমাকে পাত্তাই দেবে না।'

'আমাকে দেখার পর ভয় কেটেছে?'

'সিওর। তোমার সঙ্গে এভাবে মিশতে পারব, কোনোদিন ইমাজিন করতে পারি নি। আই অ্যাম সো গ্রেটফুল—'

মেয়েদের মধ্যে একটা বাড়তি ইন্দ্রিয় থাকে বোধ হয়। সুজাতা বুঝতে পারছিল, অনিমেষ ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। তার বেশ মজাই লাগল।

নানা কথাবার্তার মধ্যেও আসল ব্যাপারটা কিন্তু ভোলে না অনিমেষ। রোজই সুযোগ তৈরি করে আমেরিকার কথাটা সুজাতাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। তার জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। সুজাতা অবশ্য বিশেষভাবে কোনো ভরসা দেয়নি। শুধু বলে, চেষ্টা করবে।

এদিকে বাড়িতে সেই জঘন্য ব্যাপারটা চলছিলই। সুজাতা লক্ষ করেছে, রোজই সকালে ন'টা নাগাদ ব্রেকফাস্ট সেরে মঞ্জিরা আর অশোক একই গাড়িতে পাশাপাশি বসে বেরিয়ে যায়। তখন তাদের দেখে বোঝাই যায় না, দু'জনের সম্পর্ক একটা বিস্ফোরণের স্টেজে পৌঁছে গেছে। ওদের কথাবার্তা, চালচলন, হাসি--সবই স্বাভাবিক, আদর্শ সুখী স্বামী-স্ত্রীর মতো।

সুজাতা শুনেছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মঞ্জিরা চলে যায় তার নাচের স্কুলে। সারাদিন নাচ শেখায় সে বা ফাংসানের জন্য রিহার্সাল দেয়। আর

অশোক যায় সোজা তার অফিসে।

দু'জনে বেরোয় একসঙ্গে। কিন্তু নেশায় চুর চুর হয়ে মাঝরাতে ফেরে আলাদা আলাদা। চাকরবাকরদের কাঁধে ভর দিয়ে দোতলায় এসে স্ত্রীকে খিস্তি করতে থাকে অশোক। আর মঞ্জিরাকে পৌঁছে দিয়ে যায় কাপুর নামের সেই লোকটা। টলতে টলতে ওপরে এসে রাস্তার হিংস্র মেয়ে-কুকুরের মতো চেঁচাতে থাকে মঞ্জিরা। মাঝরাতে যোধপুর পার্কের দোতলায় যে কুৎসিত নাটক দেখা যায়, পরের দিন সকালে তার চিহ্নমাত্র থাকে না। তখন সব কিছু সহজ, স্বাভাবিক।

যদিও মনে মনে সুজাতা ঠিক করে রেখেছিল, শিবনাথের পারিবারিক ব্যাপারে কোনোরকম কৌতূহল দেখাবে না, তবু একদিন ফস করে অনিমেষকে জিজ্ঞেস করল, 'কাপুর লোকটা কে?'

অনিমেষ বলল, 'হি ইজ আ বিগ গায়। দাদাদের কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান।'

মোটামুটি এরকমই একটা ধারণা করেছিল সুজাতা। স্ত্রীকে কাপুরের কাছে টোপ হিসেবে পাঠিয়ে অশোক যে চাকরিতে প্রোমোশন পেয়েছে সেটা তো প্রথম দিন রাত্তিরেই জানা গেছে। সুজাতা বিমর্ষ গলায় বলল, 'অশোকদা আর বৌদিকে নিয়ে তোমাদের ফ্যামিলিতে মারাত্মক টেনশন চলছে। টুটুল, শিবনাথ আঙ্কল আর আন্টির জন্য দুঃখ হয়। আই ফিল ফর দেম। পারটিকুলারলি ফর টুটুল।'

দুম করে অনিমেষ বলে ফেলল, 'টেনশনের এখন কী হয়েছে! দু চারদিনের ভেতর দিদি নতুন প্রবলেম নিয়ে আসছে। তখন এ বাড়ি একেবারে ফার্নেস হয়ে উঠবে।'

অবাক হয়ে সুজাতা বলল, 'দিদির আবার কী প্রবলেম?'

অনিমেষ বলল, 'তুমি তো কলকাতায় কিছুদিন আছই। নিজেব চোখেই সব দেখতে পাবে। তবে এটুকু বলে দিচ্ছি, দিদি আর জামাইবাবুর ডিভোর্স হতে বেশি দেরি নেই।'

মঞ্জিরা আর অশোকের নমুনা দেখে সুজাতার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। তার বোনের কথা জানতে চাইলে গর্ত থেকে কোন সাপ বেরিয়ে পড়বে, কে জানে। যদিও সুজাতা রিসার্চ করেছে আমেরিকায়, ফ্রি মিক্সিং

আর কথায় কথায় ডিভোর্সের দেশে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে, তবু তার মধ্যে রয়েছে একটি অক্ষত ভারতীয় মেয়ে। ইওরোপ-আমেরিকা তার এতটুকু ভাঙচুর করতে পারে নি। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের কত জাতের মানুষই তো সে দেখল, কত ধরনের পারিবারিক প্যাটার্ন! কিন্তু চিরকালের ভারতীয় ফ্যামিলি লাইফই তার কাছে সব চাইতে কাম্য মনে হয়। ডিভোর্স সে পছন্দ করে না। কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাক—এটা সে কোনোভাবেই চায় না। হয়তো সুজাতাকে রক্ষণশীল বলা যায় কিন্তু তাতে তার কিছুই আসে যায় না। অনিমেষের দিদির প্রবলেম সম্পর্কে সুজাতা আর কিছুই জানতে চাইল না।

অনিমেষ আবার বলল, 'আমাদের বাড়িতে যা দেখছ, কলকাতার আপার সোসাইটির প্রায় ঘরে ঘরেই এই পিকচার। মানি, পাওয়ার আর পজিশানের জন্যে কেউ বোনকে কেউ বউকে 'বেইট' হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। ফ্যামিলি লাইফ টোটালি শ্যাটার্ড হয়ে যাচ্ছে।'

সুজাতা চমকে উঠল। অনিমেষের কথা যদি ঠিক হয়, এই শহরে আশান্বিত হবার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। জীবনের গভীর স্তর পর্যন্ত এখানে পচন ধরে গেছে।

॥ আট ॥

আজ রবিবার।

সকালে মুখটুখ ধুয়ে ডাইনিং রুমে এসে বাড়ির সবার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে বসেছিল সুজাতা। শুধু শিবনাথ বাদ। যতক্ষণ অশোক আর মঞ্জিরা বাড়িতে থাকে, তিনি পারতপক্ষে নিজের ঘর থেকে বেরোন না।

স্নেহসুধা একধারে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন। একটা চাকরকে দিয়ে যার যা দরকার, কিচেন থেকে আনিয়ে আনিয়ে দিচ্ছেন।

এই সময় হৈ হৈ করতে করতে পরিতোষ এসে হাজির। তাকেও অমলেট, টোস্ট, কর্ণফ্লেকস ইত্যাদি দেওয়া হল। বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছে বলেও স্নেহসুধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না।

খেতে খেতে সুজাতার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে পরিতোষ বলল, 'আজ কিন্তু আমার আসার কথা ছিল।'

'আমার মনে আছে।' সুজাতাও হাসল, পরিতোষ আসবে বলে কাল রাত্তিরেই সে সুটকেশ টুটকেশ গুছিয়ে রেখেছে।

'এখনও স্লামে গিয়ে থাকার ইচ্ছাটা আছে তো? না কি মত পাল্টে গেছে?'

'মত পাল্টাবার কোনো কারণ তো ঘটে নি।'

'তা হলে ব্রেকফাস্ট করেই কিন্তু বেরিয়ে পড়ব। ন'টা পর্যন্ত শঙ্কর আমাদের জন্যে ওয়েট করবে।'

'শঙ্কর কে?'

'দ্যাট বয়—মানে বেলেঘাটার সেই ছোকরা।'

টেবলের ওধার থেকে অনিমেষ বলল, 'বেলেঘাটার যে মস্তানের কথা সেদিন বলেছিলে—'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ল পরিতোষ ।

স্নেহসুধা উদ্বিগ্ন মুখে সুজাতাকে বললেন, 'ওসব খারাপ জায়গায় যাবে কিনা, এখনও ভেবে দেখ।'

অশোক এবং মঞ্জিরা সুজাতার কলকাতায় আসার উদ্দেশ্যটা জানে। তারাও একই কথা বলল।

সুজাতা বলল, 'আপনারা ভাববেন না। আমার কোনো ক্ষতি হবে না।'

দ্রুত ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে উঠে পড়ল সুজাতা। দু মিনিটও লাগল না, নিজের ঘর থেকে সুটকেশটা এনে প্রথমে শিবনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফের ডাইনিং রুমে এল। স্নেহসুধার উদ্দেশে বলল, 'চলি আন্টি, অশোকদা, বৌদি, টুটুল। চলি অনিমেষ।' তারপর পরিতোষের দিকে ফিরে বলল, 'চলুন পরিতোষদা।'

অনিমেষ উঠে পড়েছিল। সে বলল, 'চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই। কেমন জায়গায় থাকবে দেখে আসি।'

অশোক অনিমেষকে বলল, 'যা। হঠাৎ কোনো দরকার টরকার হলে খবর তো দিতে হবে।'

পরিতোষ একটা জিপ নিয়ে এসেছিল। নিচে এসে সুজাতা আর অনিমেষকে গাড়িতে তুলে স্টার্ট দিল সে। আস্তে আস্তে গাড়িটা গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে গেল।

স্নেহসুধারা ওদের সঙ্গে নেমে এসেছিলেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন।

বেলেঘাটায় এসে আগে লোকাল থানায় চলে এল পরিতোষ। জিপ থেকে না নেমে একটা কনস্টেবলকে দিয়ে ও.সি.'ক ডাকিয়ে আনল।

ও.সি ছুটতে ছুটতে এসে প্রথমেই গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে স্যালুট করল। তারপর সসম্ভ্রমে বলল, 'আপনার জন্যেই ওয়েট করছিলাম স্যার।'

পরিতোষ বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

ও.সি'র বয়স বেশ কম, আটাশ তিরিশের বেশি হবে না। টান টান, স্মার্ট চেহারা। তার চোখ দুটো গভীর কৌতূহলে বার বার সুজাতার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। সুজাতা একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। পরিতোষ এবার সুজাতাকে দেখিয়ে বলল, 'সরকার, এ হল সুজাতা, আমার মহারাস্ট্রিয়ান সিস্টার। এর কথা তোমাকে আগেই বলেছি।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

এতক্ষণে ও.সি.'র ওভাবে তাকানোর কারণটা বুঝতে পারল সুজাতা। তার সম্পর্কে ও.সি.'র সঙ্গে পরিতোষের তা হলে কথা হয়েছে। সুজাতার অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে গেল।

এবার ও.সি.'র সঙ্গে সুজাতার পরিচয় করিয়ে দিয়ে পরিতোষ বলল,

'সরকার, আমাদের দিক থেকে সুজাতার সব রকম সেফটি আর প্রোটেকশনের দায়িত্ব তোমার।'

ও.সি. বলল, 'নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। আপনার কথামতো এঁর প্রোটেকশনের সব রকম ব্যবস্থা করেছি। তা ছাড়া আমি নিজে গিয়ে রোজ তিন চার বার খোঁজ খবর নিয়ে আসব।'

'ঠিক আছে। আমরা এখন চলি।'

পরিতোষ স্টার্ট দিতে যাবে, ব্যস্তভাবে ও.সি. বলে উঠল, 'স্যার, নামবেন না। আপনারা একটু চা খেয়ে গেলে আমার খুব ভাল লাগত।'

'আজ সময় নেই। তোমার সঙ্গে সুজাতার আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে আজ এসেছিলাম। চা আরেক দিন হবে।' বলতে বলতেই জিপ চালিয়ে দিল পরিতোষ।

থানা থেকে বেরিয়ে এক কিলোমিটার যেতেই রেল লাইনের গায়ে বস্তি পাওয়া গেল। প্রায় মাইলখানেক জায়গা জুড়ে খাপরা এবং টালির চাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কলকাতায় যত বড় বড় কুখ্যাত স্লাম আছে, বেলেঘাটার এই বস্তি তার একটা।

বস্তিটার সামনে সি. এম. ডি. এ নতুন টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছে। সেখানে মেয়ে পুরুষ এবং বাচ্চাকাচ্চাদের প্রচণ্ড ভিড়। জলের জন্য চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি চলছে। টিউবওয়েল থেকে খানিকটা দূরে জঞ্জালের পাহাড়। তার পাশেই দু-চারটে বাচ্চা একেবারে উদোম হয়ে প্রাকৃতিক কর্মটি সমাধা করতে বসেছে। দুর্গন্ধে বাতাস একেবারে মাত হয়ে আছে।

জিপ দেখে আপাতত ঝগড়া স্থগিত রেখে ভিড়টা সেদিকে তাকাল। পরিতোষ হাতের ইশারায় লুঙ্গিপরা একটা লোককে কাছে ডেকে বলল, 'শঙ্করকে খবর দাও। বল লালবাজার থেকে চ্যাটার্জিসাহেব এসেছেন।'

লোকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বস্তির ভেতর ঢুকে পড়ল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক যুবককে সঙ্গে করে বেরিয়ে এল।

ছোকরার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। ইস্পাতের ধারাল ফলার মতো চেহারা। গায়ের রং তামাটে। লম্বাটে মুখে তিন চার দিনের দাড়ি। শক্ত চোয়াড়ে চেহারা তার, চোখের তারা কটা। চুল অবহেলায় পেছন দিকে উল্টে দেওয়া। গলার নিচের দিকে একটা লম্বা কাটা দাগ। দেখেই বোঝা হায়,

কেউ ছুরি চালিয়েছিল।

পরনে আধময়লা চাপা ফুল প্যান্ট আর বুকখোলা স্পোর্টস গেঞ্জি। পায়ে পুরু সোলের চটি।

ছোকরা অর্থাৎ শঙ্করের সমস্ত চেহারার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভঙ্গি রয়েছে। সে বলল, 'এসে গেছেন স্যার? আপনার কথাই ভাবছিলাম।' চেহারায় যা-ই থাক, গলার স্বরটা কিন্তু তার বেশ নরম।

পরিতোষ বলল, 'সুজাতাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ও এখানে থাকার জন্য রেডি হয়ে এসেছে। আলাপ টালাপ করে নে।'

সুজাতার দিকে তাকিয়ে ডান হাতটা সামান্য তুলে শঙ্কর বলল, 'নমস্কার ম্যাডাম।'

সুজাতা একদৃষ্টে শঙ্করকে দেখছিল। যার উপর নির্ভর করে তাকে কিছুদিন এ বস্তিতে থাকতে হবে তাকে যেন চোখ দিয়ে যতটা সম্ভব মেপে নিচ্ছিল। হাতজোড় করে সে বলল 'নমস্কার।'

শঙ্কর বলল, 'একটা কথা ব্রেনে ঢুকচে না ম্যাডাম।'

'কী?'

'আমেরিকার মতো টেরিফিক জায়গা থেকে এসে কলকাতার এ বস্তিতে থাকতে কি পারবেন? জান পাংচার হয়ে যাবে।'

বাংলাতেই কথা বলছে শঙ্কর কিন্তু তার কথাগুলো অন্য ধাঁচের, অনেকটা 'ককনি' টাইপের। হয়তো এখানকার বস্তিতে এই লাংগুয়েজই চালু রয়েছে। আন্দাজে মানে করে নিয়ে সুজাতা বলল, 'আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

'তা হলে আর জিপে বসে থেকে কী হবে, বস্তিতে 'ইন' করবেন চলুন।'

পরিতোষ বলল, 'যা যা বলেছিলাম সব ব্যবস্থা করে রেখেছিস তো?'

'আমার দিক থেকে গলতি পাবেন না স্যার। সব রেডি।'

সুজাতার দিকে ফিরে পরিতোষ বলল, 'চল তা হলে।' বলে নেমে পড়ল।

সুজাতা সুটকেশ হাতে করে নামল, তার সঙ্গে অনিমেষও।

সেই লুঙ্গিপরা লোকটার দিকে ফিরে শঙ্কর বলল, 'আ বে, ম্যাডামের

ত থেকে সুটকেশটা নিয়ে নে। মেয়েমানুষ মাল বয়ে নিয়ে যাবে, আর ম্ভি মাকড়া দাঁত বার করে দেখবে। নে শালা।'

লোকটা প্রতিবাদ করল না। বরং হুকুম পাওয়া মাত্র এসে ছোঁ মেরে জাতার হাত থেকে সুটকেশটা নিয়ে কাঁধে চড়াল। বোঝা গেল, শঙ্করকে য় পায় সে।

এবার শঙ্কর পরিতোষকে জিজ্ঞাসা করল,'স্যার, আপনিও ভেতরে যাবেন কি?'

'সুজাতার থাকার কী ব্যবস্থা করেছিস, দেখেই যাই।' পরিতোষ বলল।

'রেইড করার সময় ছাড়া আর কখনও তো আমাদের বস্তিতে ঢোকেন । ম্যাডামের জন্য তবু আজ যাচ্ছেন। আমাদের ফোরটিন জেনারেশন দ্ধার হয়ে যাবে।' বলে মজা করে একটু হাসল শঙ্কর।

পরিতোষ বলল, 'ফাজলামো করতে হবে না। চল—' বলার ধরনে ন হয়, শঙ্কর সম্পর্কে তার মনে কোথাও একটু দুবর্লতা আছে। হয়তো টুটা স্নেহও।

'আসুন—'ঘুরে বস্তির দিকে পা বাড়াল শঙ্কর। তার পেছন পেছন রতোষরা এগিয়ে চলল। টিউবওয়েলের পাশের সেই জটলাটা অবাক য়য়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

বস্তিতে পা দিয়েই সুজাতার মনে হল, মারাত্মক এক গোলকধাঁধায় পড়েছে। সাপের পাঁচের মতো অগুনতি গলি সামনে পেছনে ডাইনে য় এঁকেবেঁকে চলে গেছে। সেগুলো এতই সরু যে তিন চার জন লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। দু'ধারে দমচাপা সারি সারি ঘর। প্রতিটি ঘর সামনে হেলানো বারান্দা, সেখানে রান্নার ব্যবস্থা। বোঝা যায়, প্রতিটি ব একটা করে ফ্যামিলি থাকে।

গলিগুলো নোংরা ময়লায় বোঝাই। থুতু, কফ, মাছের কাঁটা, পানের ক, আনাজের খোসা—এ সব তো আছেই। ফাঁকে ফাঁকে বিষ্ঠাও চোখে ড়। আসলে এগুলো একই সঙ্গে পায়ে চলার পথ এবং নর্দমা।

মাথার ওপর দিয়ে একটানা টিনের চাল চলে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে থবীর আলো বাতাস এখানে ঢুকতে চায় না। এই দিনের বেলাতেও ানে ছায়া ছায়া অন্ধকার।

প্রথমে সুজাতার মনে হয়েছিল গোলকধাঁধা। যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে জায়গাটা একটা প্রকাণ্ড গ্যাস চেম্বার। এখানকার বাতাসে বেঁচে থাকার মতো যথেষ্ট অক্সিজেন নেই।

নাকে রুমাল চেপে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো গলিগুলো দিয়ে জঞ্জাল আর বিষ্ঠা টপকে টপকে সবাই এগিয়ে যাচ্ছিল। শঙ্কর আর সেই লোকটাই শুধু নির্বিকার।

এগিয়ে যেতে যেতে সুজাতার চোখে পড়ল, দু'ধারের ঘরগুলো থেকে নানান বয়সের মেয়ে পুরুষ এবং বাচ্চা-কাচ্চা অসীম কৌতূহলে তাদের দেখছে। তবে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না। সবারই ঠোঁট আঁটা।

চলতে চলতে আচমকা ঘাড় ফিরিয়ে শঙ্কর বলল, 'ম্যাডাম, একটা কথা বলব—'

সুজাতা মাথা নাড়ল, 'বলুন না—'

'আমাদের বস্তির স্যাম্পেল তো দেখছেন।'

'হ্যাঁ।'

'এখনও হড়কে যাবার সময় আছে। ভেবে দেখুন।'

কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারল না সুজাতা। জিজ্ঞাসু চোখে সে পরিতোষের দিকে তাকাল। পরিতোষ বুঝিয়ে বলল, 'এখানকার যা অ্যাটমসফিয়ার তাতে তুমি থাকবে না ফিরে যাবে, তাই জিজ্ঞেস করছে।'

সুজাতা ব্যস্তভাবে বলল, 'ফিরে যাবার জন্যে এখানে আসি নি।'

চোখ কুঁচকে মজার ভঙ্গি করে একটু হাসল শঙ্কর। বলল, 'ভেরি গুড। ম্যাডামের নার্ভের জোর আছে। দেখি কদ্দিন থাকে।' বলে সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল।

সবাই এখানে থাকার ব্যাপারে বাধা দিয়েছে। শঙ্কর অবশ্য তা দিচ্ছে না। তবে মজা করে চাপা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে যা বলল তাতে মাথায় জেদই চেপে গেছে সুজাতার। সে যখন এসেছে তখন এখানে থাকবেই।

আরো খানিকটা যাবার পর ঘাড় না ফিরিয়েই শঙ্কর বলল, 'ম্যাডাম কি কলেরা ইঞ্জেকশন, ভ্যাকসিন, এ টি এস—এসব নিয়ে এসেছেন?'

কথাগুলো শুনে আবছাভাবে সুজাতার হঠাৎ মনে হল, শঙ্কর মস্তান বা রাফায়েন যা-ই হোক না, কিছুটা লেখাপড়া হয়তো জানে।

সে বলল, 'না, কেন?'

শঙ্কর বলল, 'এই তো ঝামেলায় ফেললেন। আবার শালা ডাক্তার ফাক্তার জোগাড় করতে হবে।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'এই বস্তির সব লোক ভ্যাকসিন ইঞ্জেকশান নিয়েছে?'

একটু থতিয়ে গেল শঙ্কর। তারপর বলল, 'কর্পোরেশনের হেলথ্ ডিপার্টমেণ্ট থেকে প্রত্যেক বছর ইঞ্জেকশান ফিঞ্জেকশান নিয়ে ভ্যান আসে। ভ্যানটা এলেই আণ্ডাবাচ্চা এঁড়িগেঁড়ি বৌ ফৌ নিয়ে এখানকার মাকড়াবা হাওযা হয়ে যায়। হেলথ্ওলারা যে ক'টাকে ধরতে পারে, ছুঁচ ফুঁড়ে দেয়। তারপর এক বছরের ইন্টারভ্যাল দিয়ে আবার আসে। বছরের পর বছব বস্তির মালেদের সঙ্গে হেলথ্ওলাদের চোর-পুলিশ খেল চলছে।'

সুজাতা বলল, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এখানকার ফাইভ পারসেন্ট মানে একশ জনের মধ্যে পাঁচজনও ভ্যাকসিন নেয় না।'

'তা বলতে পারেন।'

'বাকি পঁচানব্বই জন যদি ইঞ্জেকশান না নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, আমিও পারব। আপনাকে ডাক্তার জোগাড় করতে হবে না।'

শঙ্কর এবার যা বলল তা গুছিয়ে নিলে এরকম দাঁড়ায়। এখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিষাক্ত আবহাওয়ায় থেকে থেকে সবাই 'ইমিউন' হয়ে গেছে। কোনোরকম প্রিকশন না নিলেও তারা ঠিকই বেঁচে থাকবে। কিন্তু সুজাতা এসেছে এমন এক জায়গা থেকে যেখানে বাতাস থেকে খাদ্য পর্যন্ত সব কিছু বিশুদ্ধ, জীবাণুশূন্য। এখানে দু'দিন থাকলেই এই অনভ্যস্ত জায়গায় তার নীরোগ শরীরে আচমকা বিষ ঢুকে তাকে অসুস্থ করে ফেলবে। তার মধ্যে এমন প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় নি যা দিয়ে এই বস্তির পঞ্চাশ রকমের রোগের জার্ম সে ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

সুজাতা অবাক হয়ে গেল। বেলেঘাটা বস্তির এক মস্তান আমেরিকার এত খবর পেল কোত্থেকে? তার মনে হতে লাগল, শঙ্কর খুব সাধাবণ অ্যান্টিসোশাল বা রাফায়েন নয়। নিশ্চয়ই তার একটা ভাল ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে।

শঙ্কর হাঁটতে হাঁটতে এবার পরিতোষকে বলল, 'স্যার, ম্যাডামের দায়ি আমাকে দিয়ে যাচ্ছেন। রোগ ফোগ বাধিয়ে বসলে আমার ঘাড়ে দো চাপাতে পারবেন না।'

পরিতোষ বলল, 'তুই ঠিকই বলেছিস, সুজাতার প্রিকশন নেওয়া দরকার

চুপচাপ হেঁটে আসছিল অনিমেষ। এতক্ষণে সে মুখ খুলল, 'বিকেলে আমি বড় ডাক্তার নিয়ে আসব। যাকে তাকে দিয়ে ইঞ্জেকশান দেওয়া ঠিক হবে না। সিরিঞ্জ টিরিঞ্জ হয়তো স্টেরিলাইজ করা থাকবে না। যদি কোনোরকম ইনফেকশন হয়ে যায়—'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে একবার অনিমেষকে দেখে নিল শঙ্কর। তারপর আবার আগের মতো হাঁটতে লাগল।

সুজাতা অনিমেষকে বলল, 'ডাক্তার টাক্তার আনতে হবে না। অকারণে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।'

প্রায় আধ কিলোমিটার হাঁটার পর একটা ঘরের সামনে এসে থামল শঙ্কর। বলল, 'আমরা এসে গেছি স্যার।' পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'সীতা, মাকে নিয়ে এ ঘরে আয়। ওরা সব এসে গেছে।' বলেই সামনের ঘরের বারান্দায় উঠে ভেতরে ঢুকে গেল। দরজায় শেকল লাগানো ছিল, সেটা খুলে বলল, 'আসুন ম্যাডাম, আসুন স্যার—'

সবাই ভেতরে ঢুকল। ঘরের মেঝে সিমেন্টের, এককালে হয়তো অক্ষতই ছিল, এখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে এবড়ো খেবড়ো। চারদিকে ফুটোফাটা টিনের দেয়াল। পেছনের দেয়ালে পলকা কাঠের ফ্রেমে শিক বসিয়ে একটা ছোট ফোকর করা হয়েছে। ওটাকে জানালা বলা যেতে পারে। দরজা বন্ধ করলে ওই গর্তটুকু দিয়েই বাইরের বাতাস ঢুকতে পারে।

ঘরটা আবছামতো। চোখ খানিকটা সয়ে এলে দেখা গেল, একধারে দড়ির খাটিয়ায় ধবধবে বিছানা পাতা। আরেক ধারে সস্তা দামের আলনা, ছোট থ্রি পিস কাঠের টেবল চেয়ার।

সব দেখিয়ে শঙ্কর বলল, 'এর বেশি ম্যাডামের জন্যে আর কিছু ব্যবস্থা করতে পারি নি স্যার। পুওর ম্যান আমরা।' বলে হাসল।

এই সব খেলো বাজে আসবাব একেবারেই মনঃপূত হচ্ছিল না অনিমেষের। খুঁতখুঁতে গলায় সে বলল, 'এ সব চলবে না। আমি বাড়ি থেকে ভাল খাট টাট পাঠিয়ে দেব।'

'না।' শঙ্করের চোয়াল হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল। কর্কশ গলায় সে বলল, 'দামি ফার্নিচার টার্নিচার ঢুকিয়ে বস্তির ক্যারেকটার খারাপ করতে দেব না। ম্যাডাম আমাদের গেস্ট। আমরা যতটা পারি তাঁকে আরামে রাখতে চেষ্টা করব, যাতে কষ্ট ফষ্ট না হয় সে দিক দেখব। কিন্তু বড়লোকি চাল ফাল এখানে চলবে না। এই খাট চেয়ারে যদি না চলে ম্যাডাম ফিরে যেতে পারেন।'

শঙ্করের মনোভাব বুঝতে পারল সুজাতা। খুবই বিব্রতভাবে সে বলে উঠল, 'না না, কেউ এখানে কিছু আনবে না। আপনারা যা দিয়েছেন তাতেই আমি খুশি।'

শঙ্কর খানিকটা নরম হল। ঘরের একধারে লম্বা তারের নিচে ঝুলন্ত একটা বাল্ব দেখিয়ে পরিতোষকে বলল, 'ম্যাডামের জন্যে ইলেকট্রিক লাইনেরও ব্যবস্থা করেছি স্যার।'

'আরে তাই তো!' বাল্বটা দেখতে দেখতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল পরিতোষের। সে বলল, 'কিন্তু তোদের এই বস্তিতে তো ইলেকট্রিক কানেকশান নেই!'

'না।' ঘাড় কাত করল শঙ্কর, 'কিন্তু ম্যাডাম সেই আমেরিকা থেকে আসছেন। ইংলিশ পিকচারে আমি আমেরিকা দেখেছি। টেরিফিক জায়গা। সেখানে কত লাইট, শালা কত জেল্লা! অত আলো ফালো থেকে এসে বেলেঘাটার বস্তিতে হেরিকেনের পাল্লায় পড়লে ম্যাডামের চোখের বারোটা বেজে যাবে। তাই ইলেকট্রিক ঝোলাতে হল।'

'লাইটের কানেকশান পেলি কোত্থেকে?'

শঙ্কর বলল, 'ও সব জিজ্ঞেস করে ঝামেলায় ফেলবেন না স্যার।'

একটু অবাক হয়ে পরিতোষ বলল, 'কেন রে?'

'আমি বলি কি আর আপনি কালো গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে লক-আপে ঢুকিয়ে দিন। ও সব কারবারে আমি নেই।'

শঙ্করের বলার মধ্যে এমন একটা মজার ব্যাপার ছিল যাতে হেসে

ফেলল পরিতোষ। তাকে লাইট নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

শঙ্কর আবার বলল, 'বিকেলে একটা টেবল ফ্যান ভাড়া করে এনে ফিট করে দেব।'

পরিতোষ জিজ্ঞেস করল, 'অ্যারেঞ্জমেন্ট তো ভালই করেছিস কিন্তু বাথরুমের কী হবে? তোদের এখানকার বারোয়ারি বাথরুমগুলোর যা হাল! সুজাতা সেখানে ঢুকতে পারবে না।'

শঙ্কর জানালো, সি. এম. ডি. এ কয়েকদিন আগে এখানে অনেকগুলো বাথরুম আর পায়খানা বানিয়ে দিয়ে গেছে। সুজাতার আসার খবর পেয়ে সে একটা বাথরুমে তালা দিয়ে রেখেছে। এখনও সেটা একেবারে নতুনই রয়েছে।

শঙ্কর বলল, 'ম্যাডাম ওটা উদ্বোধন করবেন। যদ্দিন আমাদের কাছে থাকবেন, একাই ব্যবহার করবেন। ইনি চলে গেলে বস্তির পঙ্গপালের জন্য বাথরুমটা ছেড়ে দেওয়া হবে।'

পরিতোষ খুশি হলেন, সস্নেহে শঙ্করের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ শঙ্কর। অ্যারেঞ্জমেন্ট চমৎকার হয়েছে। কিন্তু ওর খাওয়া দাওয়ার কী হবে?'

'আমরা যা খাই ম্যাডাম কষ্ট করে তাই খাবেন।'

'তা তো খাবেই। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'আমি যা বলব শুনে একদম রাগ করতে পারবি না।'

কিছুটা সন্দিগ্ধ চোখে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে শঙ্কর বলল, 'আগে বলুন তো—'

'এমনিতেই তোর ওপর অনেক জুলুম করছি।' পরিতোষ বলতে লাগল, 'সুজাতার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আমরা যদি কিছু দিই?'

'খাওয়ার দাম দিতে চাইছেন?' শঙ্কর স্থির চোখে তাকাল, চাপা তীব্র গলায় বলল. 'মেজাজটা কিচাইন করে দিলেন স্যার। ম্যাডাম আমাদের গেস্ট। ওঁর খাওয়ার জন্যে পয়সা নেব! আপনি ওঁকে ফেরত নিয়ে যান স্যার।'

একটু হাসল পরিতোষ। শঙ্করেব গালে আদরের ভঙ্গিতে আলতো

করে টোকা মেরে বলল, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে। পয়সার কথাটা মনে রাখিস না। আমরা এবার চলি।'

'তাই কখনো হয় স্যার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কথা বললেন। এবার একটু বসুন। চা না খেয়ে যেতে পাববেন না।' বলেই বেরুতে যাচ্ছিল শঙ্কর। দেখল, বাইরের দরজার কাছে সীতা আর মলিনা দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ল, কিছুক্ষণ আগে সে ওদের ডেকেছিল।

সীতার বয়স কুড়ি বাইশ, রং কালো কিন্তু মুখটা ভারি মিষ্টি। বড় বড় টানা চোখ, পাতলা নাক, মাথায় প্রচুর চুল। তার বিয়ে হয় নি।

মলিনার বয়স ষাটের ওপরে। একসময় চেহারাটা ভালই ছিল, এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপ। চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠ হয়ে গেছে। গায়ের চামড়া কোঁচকানো, চোখের নিচে কালির পোঁচ। দেখেই টের পাওয়া যায়, তার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে।

মলিনা বিধবা। তার পরনে সরু পাড়ের মিলের ধুতি আর সাদা সেমিজ।

শঙ্কর সুজাতাদের কাছে সীতার আর মলিনার পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমার মা আর বোন।' তারপর দরজার দিকে ফিরে বলল, 'যা সীতা, সাত আট কাপ চা করে নিয়ে আয়। কুইক। এঁদের কিন্তু বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারব না।'

সীতা আর দাঁড়াল না, 'আচ্ছা' বলেই ছুট লাগাল। তাব পেছনে মলিনাও ছুটল।

মিনিট দশেক বাদে সস্তা খেলো কাপে চা আর একটা পুরনো স্টেনলেস স্টিলের থালায় বাজে বেকারির কিছু নোনতা বিস্কুট সাজিয়ে ফিরে এল দু'জনে।

চা খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে অনিমেষ আর পরিতোষ উঠে পড়ল। অনিমেষ বলল, রোজই একবার করে এসে সুজাতাকে দেখে যাবে। পরিতোষ জানালো রোজ তার পক্ষে আসা সম্ভব না, মাঝে মাঝে আসবে।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে নিচের রাস্তায় নামল। শঙ্কর সুজাতাকে বলল, 'আমি স্যারেদের এগিয়ে দিয়ে আসছি ম্যাডাম।' সীতা আর মলিনাকে বলল, 'তোমরা একটু ম্যাডামের কাছে বসো। আমি যাব আর আসব।'

পরিতোষরা চলে যাবার পর মলিনা আর সীতাকে দড়ির খাটিয়ায় নিজের পাশে বসাল সুজাতা। ওরা প্রথমে বসতে চায় নি, সুজাতাকে একরকম জোরই করতে হয়েছে।

ওরা বসেছে ঠিকই, তবে খুবই জড়সড় হয়ে, অনেকটা দূরত্ব রেখে। তাদের চোখেমুখে বিস্ময় ভয় কৌতূহল ইত্যাদি মেশানো অনেক কিছু। শঙ্করের কাছে সুজাতা সম্পর্কে সীতারা যাবতীয় খবর পেয়েছে আগেই। সুজাতা বিরাট বড়লোকের মেয়ে, বিদেশে থাকে, প্রচুর লেখাপড়া জানে। এই সবের জন্য তারা খুব সহজ হতে পারছিল না।

সীতাদের অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ কিছুটা বুঝতে পেরেছে সুজাতা। ওদের আড়ষ্টতা কাটাবার জন্য হেসে হেসে প্রায় ওদের লেভেলে নেমেই গল্প করতে লাগল সে। কথায় কথায় জেনে নিল ওরা কতদিন এখানে আছে, সীতা কতটা পড়াশোনা করেছে, মাসে ক'টা সিনেমা দেখে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে মজাব কথাও বলছে সুজাতা।

আড়ষ্ট ভাবটা যখন কেটে আসছে, সেই সময় শঙ্কর ফিরে এল। এক পলক তিনজনকে দেখে বলল, 'আসর বেশ জমে উঠেছে দেখছি।'

সুজাতা হালকা গলায় বলল, 'আপনিও আমাদের সঙ্গে বসে যান।'

ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বসতে বসতে শঙ্কর বলল, 'বেশিক্ষণ বসার সময় নেই। আমাকে একবাব বেরুতে হবে। তার আগে কাজের কথাগুলো সেরে নিই।'

উৎসুক চোখে তাকাল সুজাতা।

শঙ্কর বলতে লাগল, 'সীতা এখন থেকে আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে যাবে। আপনার কোনো অসুবিধা হলে ওকে বলবেন, ও সব ঠিক করে দেবে। আরেকটা ব্যাপার ভেবেছি, রাত্তিরে সীতা আপনার কাছে থাকবে; নিচে বিছানা করে শোবে।'

সুজাতা বলল, 'ঠিক আছে। সব সময়ের জন্যে একজন সঙ্গী পেলে আমার ভালই লাগবে। তা ছাড়া সীতা চমৎকার মেয়ে।'

শঙ্কর বলল, 'এবার সব চাইতে জরুরি কথাটা বলি। আপনার আসল কাজ কবে স্টার্ট করতে চান?'

'আপনি যেদিন বলবেন।'

'আমার ইচ্ছে আজ থেকেই। বস্তি ফস্তি তো ভাল জায়গা না, কখন শালা কী ঝামেলা বেধে যাবে। কাজটা চুকিয়ে যত তাড়াতাড়ি হয় এখান থেকে হড়কে যান।'

'আমার আপত্তি নেই। আজই শুরু করব। কিন্তু সে ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।'

'কী সাহায্য বলুন।'

'আমার কাজ হল মানুষ নিয়ে। কিন্তু এখানকার কাউকেই চিনি না। সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। নইলে এগুতেই পারব না।'

একটু চিন্তা করে শঙ্কর বলল, 'নো প্রবলেম। আজই পরিচয় ফরিচয় হয়ে যাবে।' বলেই সীতার দিকে ফিরল, 'যা তো, ঝট করে ঝন্টেকে ডেকে নিয়ে আয়।'

সীতা চলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রোগা, পোকায়-খাওয়া চেহারার একটা ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে এল। দেখামাত্রই বোঝা যায়, এত কম বয়সেই নেশাটেশা করে শরীর একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে ছোকরা। ফ্যাসফ্যাসে গলায় সে বলল, 'কী হয়েছে গুরু, ডাকিয়ে আনলে কেন?'

শঙ্কর বলল, 'একটা কাজ করতে হবে। সি. এম. ডি. এ-র পায়খানাগুলোর পেছনে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে বিকেলে বস্তির লোকেদের সেখানে চলে যেতে বলবি।'

'নেতা ফেতাদের মতো মিটিং করবে নাকি? মিনিস্টার ফিনিস্টার হবার ধান্দা করছ?'

'কী করব তখন দেখতে পাবি। এখন ফুটে যা মাকড়া।'

'ফুটছি। লেকেন গুরু, বস্তির এতগুলো মালকে খবর দিতে হবে, শালা কিরকম খাটনি বোঝো। হাঁটতে হাঁটতে কোমরের বল্টু ঢিলে হয়ে যাবে। এক বোতল চুল্লু খাওয়াবে তো গুরু?'

'মারব এক লাথ। চুল্লু খাবে শালা খজড়া—'

ঝন্টে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে চলে গেল। সে জানে শঙ্করের কথামতো কাজটা করে দিলে সন্ধেবেলা চুল্লুর পয়সা সে পাবেই।

শঙ্কর আর বসল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখন চলি ম্যাডাম। বিকেলে দেখা হবে।—সীতা ম্যাডামকে ভাল করে খাওয়াস। যত্ন ফত্ন করিস।

আমাদের বদনাম যেন না হয়ে যায়।'

সীতা বলল, 'তুমি খেয়ে যাবে না দাদা?'

'না। ফিরে এসে খাব।' বলেই দরজার দিকে পা বাড়াল শঙ্কর।

যদিও অশোভন তবু নিজের অজান্তে ফস করে সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন এত বেলায়? খেয়ে দেয়ে বেরুলে হতো না?'

নিজের পেটে টোকা মেরে শঙ্কর বলল, 'এর ধান্দায় যেতে হচ্ছে ম্যাডাম।' দু আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে বলল, 'ক্যাশের খুব দরকার। রেলের সাইডিংয়ে মালভর্তি ওয়াগন এসেছে। ব্যাপারটা দেখে—'বলতে বলতে আচমকা থেমে গেল।

রীতিমত অবাকই হল সুজাতা। বলল, 'ওয়াগন দেখতে যাবেন!'

'হ্যাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল শঙ্কর, 'ওগুলো সাইডিংয়ে কী পজিসানে রেখেছে দেখে আসি। নইলে রাত্তিরে অপারেশন চালাব কী করে?'

'মানে?'

স্থির চোখে সুজাতার দিকে তাকিয়ে শঙ্কর বলল, 'পুলিশ অফিসার চ্যাটার্জিসাহেব আমার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেন নি? মানে আমি কী করি টরি—'

'না তো।'

'স্যার আমাকে একটু ভালো ফালো বাসেন তো। তাই হয়তো বলেন নি। কিছুদিন আপনি এখানে থাকবেন, আমার সম্বন্ধে আপনার সব কথা জানা দরকার।' শঙ্কর বলতে লাগল, 'আমি একটা অ্যান্টিসোশাল, এই বেলেঘাটা এরিয়ায় ফেমাস ওয়াগন ব্রেকার। ওয়াগনের পেট থেকে মাল খালাস করে নিজেদের পেট চালাই।' একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করল, 'খবর নিলে জানতে পারবেন, পুলিশের খাতায় আমার নাম বড় বড় টাইপে লেখা রয়েছে।'

সুজাতা উত্তর দিল না। এত স্পষ্টভাবে অকপটে কেউ যে নিজের গ্লানিকর ঘৃণ্য জীবনের কথা বলতে পারে, তার ধারণা ছিল না।

শঙ্কর হাসল, 'নিশ্চয়ই ঘেন্নায় থুতু ফুতু ফেলতে ইচ্ছে করছে, তাই না?'

সুজাতা আবছা গলায় কী বলল বোঝা গেল না।

শঙ্কর বলল, 'ও-কে ম্যাডাম এখন চলি। বিকেলে দেখা হবে।' ঘর থেকে বেরিয়ে সে যখন সামনের গলিতে নেমেছে সেই সময় দৌড়াতে দৌড়ুতে একটা ছোকরা এসে তার সামনে দাঁড়াল। দারুণ হাঁপাচ্ছে সে। চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, 'শঙ্করদা, তুমি এখানে! তোমাকে আমি সারা বস্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি—'

শঙ্কর বলল, 'কেন?'

'টেরিফিক ঝামেলা হয়ে গেছে।'

'কী ঝামেলা?'

'বাইশ নম্বরের ফন্টা জেল থেকে বেরিয়ে আজ ফিরে এসেছে।'

মুহূর্তে মুখচোখের চেহারা পাল্টে গেল শঙ্করের। চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠল। চোখের কটা তারা দুটো ছুরির ফলার মতো ঝক ঝক করতে লাগল। নিচু গলায় সে বলল, 'ঠিক আছে। হারামীর দিকে সবসময় নজর রাখবি। কিছু গড়বড় বুঝলে আমাকে খবর দিবি।'

'আচ্ছা গুরু।'

'এখন যা।'

ছোকরা বাঁ দিকে চলে গেল। শঙ্কর আর দাঁড়াল না, ডান দিকে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল।

ওদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছিল সুজাতা। লক্ষ করল, ফন্টার জেল থেকে বেরুবার খবরটা মলিনা এবং সীতাকেও অস্থির করে তুলেছে। তাদের মুখেচোখে ভয় এবং আতঙ্কের ছাপ।

সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'বাইশ নম্বরটা কি?'

সীতা বলল, 'আমাদের বস্তির ডান দিকে আরেকটা বড় বস্তি আছে। ওটাকে বাইশ নম্বর বলে।'

'ফন্টা কে?'

সীতা এবার যা বলল তা এইরকম। ফন্টা মারাত্মক টাইপের ক্রিমিনাল। মার্ডার, ব্যাঙ্ক রবারি থেকে শুরু করে নোট জাল, ওয়াগন ভাঙা পর্যন্ত এমন কোনো কাজ নেই যা সে করে না। কথায় কথায় ছুরি আর পাইপগান চালায়। এই এলাকার টেরর সে। কতবার জেল খেটেছে ফন্টা তার হিসেব নেই। সে যা খুশি করুক তা নিয়ে সীতাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু যেটা খুবই ভয়াবহ ব্যাপার তা হল শঙ্করের সঙ্গে তার একটা পুরনো ঝগড়া রয়েছে। আগে অনেক বার ফন্টার গ্যাংয়ের সঙ্গে শঙ্করের গ্যাংয়ের প্রচুর বোমাবাজি আর মারপিট হয়ে গেছে। বছরখানেক আগে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির মামলায় ফন্টা জেলে যাবার পর এই অঞ্চলটা বেশ শান্ত ছিল, এখন আবার ঝামেলা শুরু হবে। ফন্টার ধারণা, তার এই শেষ জেলটার পেছনে শঙ্করের হাত আছে। সে শাসিয়ে গিয়েছিল, জেল থেকে ফিরে এর শোধ তুলবে। পুরনো শত্রুতার জের টেনে শঙ্করের ওপর সে যে হামলা চালাবে, সে সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ নেই। সীতাদের ভয় এবং দুশ্চিন্তা সেই কারণে।

॥ নয় ॥

দুপুরে সুজাতাকে সি. এম. ডি. এ-র বাথরুমে নিয়ে গেল সীতা। তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল।

একটু পর স্নান টান সেরে ঘরে এসে বসতে না বসতেই সীতা দৌড়ে গিয়ে ভাত টাত নিয়ে এল। সুজাতা বলল, 'আমি একা খাব নাকি? তোমাদের ভাতও নিয়ে এস। এক সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।'

সীতারা প্রথমটা আপত্তি করেছিল। একরকম জোর করেই নিজের কাছে তাদের খেতে বসাল সুজাতা।

খেতে খেতে এলোমেলো নানারকম গল্প করতে করতে শঙ্করের কথা উঠল।

মলিনা বলল, 'ফন্টাটা জেল থেকে বেরিয়েছে। শোনার পর থেকেই ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। ওটা তো মানুষ না, জানোয়ার। শঙ্করের যদি কিছু হয়, আমাদের যে কী হাল হবে!'

সীতাও প্রায় এক সুরে একই কথা বলল।

মলিনা আবার বলল, 'পথে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। ও তুলে এখানে নিয়ে এল। মাথা গোঁজার জায়গা পেলাম, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছি। এ সবই ওর দয়ায়—'

কোথায় যেন একটা খটকা লাগল সুজাতার। মলিনার দিকে ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করল, 'ভেসে বেড়াচ্ছিলেন মানে? আপনি ওর মা নন?'

'শঙ্কর আমাকে মা করে নিয়েছে। আসলে আমি ওকে পেটে ধরি নি। চার বছর আগে চিনতামও না।' এরপর মলিনা যা বলে গেল তা চমকে দেবার মতো। তাদের বাড়ি সুন্দরবনের কাছে। তার স্বামী আর ছেলে জঙ্গল থেকে মধু, মোম আর কাঠ এনে সংসার চালাত। বছর পাঁচেক আগে একবার মধু আনতে গিয়ে আর ফিরল না তারা, দু'জনেই বাঘের পেটে গেল। একা মানুষ হলেও পেটটা তো আছে। গাঁয়ে কে তাকে খেতে দেবে? ভিক্ষে করতে সে চলে এল কলকাতায়। সারাদিন দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াত, সন্ধেবেলা ফুটপাথের ধারে বা গাড়ি বারান্দার তলায় ভিক্ষে-করা চাল ফুটিয়ে খেয়ে সেখানেই শুয়ে থাকত। এভাবে বেশ

কিছুদিন কাটল। বছর চারেক আগে হঠাৎ জ্বরে পড়ল সে। প্রচণ্ড জ্বর। বেহুঁশ হয়ে ক'দিন ফুটপাথে পড়ে ছিল, সে জানে না। জ্ঞান ফেরার পর দেখল, বেলেঘাটার এই বস্তিতে শুয়ে আছে। শুনল, শঙ্কর তাকে এখানে তুলে এনেছে। সেই থেকে শঙ্করের মা হয়ে এখানেই আছে।

মলিনা বলতে লাগল, 'শুধু আমাকেই না, আমার মতো সীতাকেও এখানে নিয়ে এসেছে শঙ্কর।'

ডান পাশে সীতার দিকে তাকাল সুজাতা। গভীর বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওর আপন বোন না?'

'না। তবে আপন বোনের চাইতেও বেশি।'

'তুমি কী করে এখানে এলে?'

'আমি ওই বাইশ নম্বরে ছিলাম। বলতে পারেন আমার জন্যে দাদার সঙ্গে ফন্টার সম্পর্কটা বেশি খারাপ হয়ে গেছে।'

'তোমার জন্যে!' খুব অবাক হয়ে গেল সুজাতা।

'হ্যাঁ। সব শুনলে বুঝতে পারবেন।'

বিমর্ষ মুখে সীতা তার কথা বলতে লাগল। একসময় তারা মোটামুটি ভালই ছিল। বাবা মা আর তাকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। বাবা একটা মাঝারি ধরনের ফ্যাক্টরিতে ছিল লেজার কিপার। চাকরি ছাড়াও এটা সেটা করে আরো কিছু রোজগার করত। চাকরি ছাড়াও এটা সেটা করে আরো কিছু আয় ছিল। তিন জনের সংসারে অভাব ছিল না। তখন সীতারা থাকত টালিগঞ্জের দু-ঘরের আলাদা একটা ফ্ল্যাটে। হঠাৎ স্ট্রাইক আর লক-আউটে বাবার কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। আর কোথাও চাকরি বাকরি জোটাতে পারল না বাবা। তার আর মায়ের যেটুকু সোনাদানা ছিল সব বিক্রি হয়ে গেল। মাসের পর মাস বাড়িভাড়া বাকি পড়ল। একদিন গুণ্ডা লাগিয়ে বাড়িওলা তাদের তুলে দেয়। এখানে সেখানে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত সীতারা চলে আসে বেলেঘাটার বাইশ নম্বর বস্তিতে।

বাইশ নম্বরে আসার পর বাবা বেশি দিন বাঁচে নি। চাকরি চলে যাবার পর থেকেই ভেতরে ভেতরে শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছিল। ক'দিন বেহুঁশ জ্বরে ভুগে আর রক্ত বমি করে দুম করে মরে গেল সে। বাবা যতদিন বেঁচে ছিল জোড়াতাড়া দিয়ে দু'মুঠো পেটের ভাত জোগাড় করে আনছিল। সে

মরে যাবার পর মাকে পেটের জন্য বাইরে বেরুতে হল। লোকের বাড়ি বাসন মেজে, কাপড় কেচে, রান্না করে কোনো রকমে চালাতে লাগল মা। এই সময় সীতার জীবনের সব চাইতে মারাত্মক ঘটনাটা ঘটল। সে যুবতী হয়ে উঠল। এবং তার ওপর ফন্টার নজর এসে পড়ল।

মা যখন কাজে বেরুত তখন বস্তির ঘরে একা একাই থাকত সীতা। সেই সময় ফন্টা এসে রোজ তাদের ঘরের সামনে দাঁড়াত। কোনো দিন তার জন্যে নিয়ে আসত এগরোল, কোন দিন গরম সিঙাড়া, কোনো দিন সেন্ট বা ব্লাউজের পিস। তাকে ধর্মেন্দ্র হেমার ছবি দেখাতে নিয়ে যেতে চাইত ফন্টা। কিন্তু কিছুই নিত না সীতা, ফন্টাকে দেখলেই ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে যেত সে।

মাকে দিন রাত মুখে রক্ত তুলে খাটতে হয়। তার ওপর ফন্টাব কথা বলে দুশ্চিন্তা বাড়াতে চায় নি সীতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা না জানিয়ে পাবে নি। শোনার পর থেকে মা তাকে আর বস্তিতে ফেলে রেখে যেত না, কাজে বেরুবার সময় নিজের সঙ্গে নিয়ে যেত।

মা যতদিন বেঁচে ছিল, দু-হাতে তাকে আগলে আগলে রেখেছে। কিন্তু সীতার এমনই বরাত, মাথার প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে একদিন কাজ থেকে ফিরে মা সেই যে বিছানায় শুল, আর উঠল না।

মা-বাবা তার জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমিয়ে রেখে যায় নি যে ঘবে বসে থাকলেই চলবে। মা'র মৃত্যুর দু'দিন পর থেকেই সে যে বাড়িতে কাজ করত, পেটের জন্য সীতাকে সেখানে বেরুতে হল। এই সময়টায় সে পুরোপুরি অরক্ষিত, তাকে বাঁচাবার কেউ নেই। ওদিকে ফন্টা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠল। প্রায় রোজই সে বলত, 'ওসব ঝিগিরি ফিগিরি ছেড়ে দে। আমি তোকে হিরোইনদের মতো আরামে রাখব।'

সীতা উত্তর দিত না।

একদিন ফন্টা বলেছিল, 'তোর মা মরেছে বলে অ্যাদ্দিন কিছু বলি নি। ধৈর্য কিন্তু পাংচার হয়ে যাচ্ছে। আজ রাত্তিরে দরজা খুলে শুবি। আমি যাব।'

সীতা শিউরে উঠেছিল। তবে রাত্তিরে সে দরজা খুলে রাখে নি। ফন্টা চুল্লু খেয়ে এসে টোকা দিতে দিতে জড়ানো চাপা গলায় ডেকেছিল, 'অ্যাই

ছুকরি—অ্যাই সীতা—'

সীতা ঘুমোয় নি। আচমকা তার রক্ত প্রবাহে কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল। সে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠেছিল, 'কে আছ, বাঁচাও—বাঁচাও—'

মুহূর্তে একটা প্রবল ধাক্কা খেয়ে বাইশ নম্বর বস্তির মাঝরাতের ঘুম ছুটে গিয়েছিল যেন। ঘরে ঘরে হেরিকেন ফেরিকেন জ্বলে উঠেছিল। চারদিক থেকে মানুষজন হৈচৈ করতে করতে এগিয়ে আসছিল।

ফন্টা আর দাঁড়ায় নি। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলেছিল, 'ঠিক আছে, আজ আমি যাচ্ছি। দেখব তোর কোন বাপ তোকে বাঁচায়! শালী হারামী—'

এর দিন দুই পর সন্ধেবেলা কাজ সেরে রেল লাইন ধরে সীতা যখন ফিরে আসছে সেই সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, কোমরে দু হাত রেখে শরীরটা ডাইনে একটু কাত করে দাঁড়িয়ে আছে ফন্টা। সঙ্গে তার দুই চামচা—জগা আর ছোনে।

চোখ কুঁচকে সীতাকে দেখতে দেখতে ফন্টা বলেছিল, 'এবার! শালী অনেকদিন তোর পেছনে চক্কোর খাচ্ছি। বহুৎ ভুগিয়েছিস। আজ তোকে ছাড়ছি না।' বলেই সীতা কিছু বুঝবার বা বাধা দেবার আগেই আচমকা তাকে জাপটে ধরে মাটি থেকে তুলে ফেলেছিল ফন্টা। তারপর একটু দূরে একটা পুরনো পরিত্যক্ত রেল গুমটির দিকে ছুটতে শুরু করেছিল।

জায়গাটা খুবই নির্জন। বাইশ নম্বর বস্তি ওখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আশেপাশে লোকজন দেখা যাচ্ছিল না। তা ছাড়া ওখানে কর্পোরেশনের লাইট টাইটও নেই।

প্রথমটা ভয়ে আতঙ্কে শ্বাস আটকে গিয়েছিল সীতার। তার মধ্যেই সে টের পাচ্ছিল, ফন্টা তার ব্লাউজের ভেতর একটা হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার আরেকটা হাত সায়ার দড়ি ছিঁড়ে ফেলছে। সর্বনাশের শেষ প্রান্তে পৌঁছে হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠেছিল সীতা। উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে, ফন্টাকে আঁচড়ে কামড়ে একেবারে রক্তারক্তি বাধিয়ে দিয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছিল না। ফন্টার দুই হাত সাঁড়াশির মতো তাকে আটকে রেখে দিয়েছিল।

জগা আর ছোনে বড় বড় পা ফেলে পাশাপাশি হাঁটছিল আর দাঁত বার

করে হাসছিল। ছোনে বলেছিল, 'মাল খুব তেজী আছে। তোমার বডি থেকে দেড় শো গ্রাম ব্লাড বার করে দিয়েছে।'

ছোনে বলেছিল, 'গুরু, শেষ পর্যন্ত শালীকে ধরে রাখতে পারবে তো? না আমরা হাত লাগাব?'

'কিস্‌সু করতে হবে না। কার পাল্লায় পড়েছে, খজড়িটাকে দু মিনিটের ভেতর মালুম পাইয়ে দিচ্ছি।'

ওরা যখন ভাঙা রেল-গুমটিটার কাছে চলে গেছে, সেই সময় উল্টোদিক থেকে চার পাঁচটা ছোকরাকে সঙ্গে করে শঙ্কর আসছিল। সীতার চিৎকারে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তারা। তারপর চটকরে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে দৌড়ে কাছে চলে এসেছিল।

শঙ্কর চাপা তীব্র গলায় বলেছিল, 'মেয়েটাকে ছেড়ে দে ফন্টা।'

ফন্টা ছাড়ে নি। তার দু চোখ ঝিকিয়ে উঠেছিল, 'ফুটে যা শঙ্কর। আমার কেসে মাথা ঢোকাতে আসিস না।'

শঙ্করের সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'আমার চোখের সামনে একটা মেয়েকে রেপ করতে দেব না। ছাড় শুয়োরের বাচ্চা—'

ফন্টা জগা আর ছোনের দিকে ফিরে বলেছিল, 'হারামীর বাচ্চাটার বডি ফেলে দে তো।'

জগা আর ছোনে দ্রুত একবার শঙ্করের গ্যাংটার দিকে তাকিয়েছে। তারপর কোমরের কাছ থেকে দুটো ছোরা বার করেছিল। আবছা অন্ধকারেও ফলাদুটো ঝকঝক করে উঠেছিল।

ঝট করে পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করে নাচাতে নাচাতে শঙ্কর বলেছিল, 'আ বে খানকির ছেলেরা, এই যন্তরটা চিনিস? লাস যদি না হতে চাস ওই মালদুটো কোমরে গুঁজে ফেল।' ফন্টাকে বলেছিল,' পাঁচ পর্যন্ত গুনব। তার ভেতর মেয়েটাকে যদি ছেড়ে না দিস, তোর পাঁজরায় তিনটে গুলি ঢুকে যাবে। ওয়ান, টু—'

থ্রি বলার আগেই সীতাকে ছেড়ে দিয়ে ফন্টা তার চামচাদেব নিয়ে চলে গিয়েছিল। যাবাব আগে বলে গিয়েছিল, ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হল না, পরে সে এর শোধ তুলবে।

শঙ্কর বলেছিল, 'যা যা বে,—' তারপর সীতার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুই কোথায় থাকিস? চল পৌঁচে দিয়ে যাই।'

সীতা মুখ নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল—সে যাবে না।

একটু অবাক হয়ে শঙ্কর এবার বলেছে, 'কেন?'

সীতা তার সব কথা এক নিঃশ্বাসে জানিয়ে বলেছে এরপর বাইশ নম্বরে গেলে ফন্টা তাকে শেষ করে ফেলবে।

শঙ্কর তক্ষুণি উত্তর দেয় নি। তার সঙ্গীরা শুধু বলেছিল, 'এ তো কিচাইন হয়ে গেল গুরু। ছুঁড়িটাকে তো বাইশ নম্বরে পাঠানো যাবে না।'

শঙ্কর বলেছিল, 'না, যাবে না। ওকে আমাদের ওখানেই নিয়ে যাব। ক'দিন থাক। তারপর চিন্তা ফিন্তা করে কিছু একটা করা যাবে।'

সেই থেকে সীতা এখানেই আছে। এদিকে তাকে নিয়ে ফন্টার সঙ্গে অনেক বার মারপিট হয়ে গেছে শঙ্করের, দু'দলে প্রচুর বোমবাজি হয়েছে।

হৃদয়বান রাজার মতো তার মেজাজ। সীতার কাজ ছাড়িয়ে দিয়েছে সে। অসীম স্নেহে শঙ্কর তাকে ঢেকে রেখেছে।

শুনতে শুনতে সুজাতার মনে হল, আমেরিকান টিভির সেই ডকুমেন্টারিতে কলকাতার স্লামের বাইরের ছবিটা হয়তো ধরা পড়েছে। কিন্তু এখানকার জীবনের গভীর স্তর পর্যন্ত ডকুমেন্টারি মেকারের ক্যামেরা পৌঁছুতে পারে নি। সবাই বলে ক্যালকাটা এক মৃত শহর, এখানকার সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু না, এই বস্তিতে জীবনের কিছু ভ্যালুজ এখনও অবশিষ্ট আছে।

সুজাতা ঠিক করে ফেলল, কলকাতা বস্তির ওপর তার নতুন বইটায় সীতা এবং মলিনার একটা বড় ভূমিকা থাকবে। আজ রাত্রেই তাদের সম্পর্কে ডিটেল নোট লিখে রাখবে সে।

খাওয়া দাওয়ার পর খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছিল সুজাতা। মলিনা এঁটো বাসনকোসন তুলে নিয়ে মেঝেটা মুছে দিয়ে গেছে। সেখানে একটা মাদুর পেতেও শুয়েছে সীতা।

শোবার পরও কিছুক্ষণ শঙ্কর সম্পর্কে কথাবার্তা হয়েছে। সীতা জানিয়েছে, শঙ্কর বেশ ভাল ফ্যামিলির ছেলে। সে বস্তির অন্য সব মস্তান

ওয়াগন ব্রেকারদের মতো নয়, প্রচুর লেখাপড়াও নাকি জানে। শঙ্কর যে অশিক্ষিত নয়, আগেই সেটা মোটামুটি আন্দাজ করেছে সুজাতা, তবে কতটা পড়াশোনা করেছে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পারছে না।

আরো জানা গেছে, এই বস্তিতে শঙ্করদের মোট তিন খানা ঘর। যে ঘরটা সুজাতাকে দেওয়া হয়েছে সেটা ছাড়া আরো দুটো। ডান পাশের ঘরটায় থাকে সীতা আর মলিনা। তারপরের ঘরটায শঙ্কব। সুজাতার ঘরটা এতদিন ফাঁকা পড়ে ছিল।

কথা বলতে বলতে সুজাতার চোখ দুটো কখন জুড়ে এসেছিল, খেয়াল নেই।

॥ দশ ॥

ঘুম ভাঙল শঙ্করের ডাকে, 'ম্যাডাম, ম্যাডাম—'

তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই সুজাতার চোখে পড়ল, বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কর। তার হাতে একটা পুরনো টেবল ফ্যান। ব্যস্তভাবে সে বলল, 'ভেতরে আসুন—'

ওদিকে মেঝেতে শুয়ে সীতাও ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে-ও ধড়মড় করে উঠে বসল।

'কাঁচা ঘুমটা চটিয়ে দিলাম তো।' বলতে বলতে ঘরের ভেতর এসে ফ্যানটা টেবলে রেখে, চটপট দেয়ালের গায়ে সুইচ টুইচ লাগিয়ে লম্বা তার দিয়ে ওপরে চালের কাছে আরেকটা তারের সঙ্গে জুড়ে দিল শঙ্কর। তারপর সুইচটা টিপতেই খট খট করে ফ্যান চলতে লাগল।

শঙ্কর মজা করে বলল, 'লাইট, ফ্যান সব লাগিয়ে দিয়েছি। আপনার ঘরটা একেবারে ফাইভ-স্টার হোটেলের কামরা হয়ে গেছে। না কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই।' ঠোটের কোণে হালকা হাসল সুজাতা।

এবার সীতার দিকে ফিরে শঙ্কর বলল, 'টেরিফিক খিদে পেয়ে গেছে। চানটা সেরে আসি, ঝটপট ভাত ফাত বেড়ে ফেল—' ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে সুজাতাকে বলল, 'ম্যাডাম, দশ মিনিটে আমার খাওয়া ফাওয়া হয়ে যাবে। এর মধ্যে রেডি হয়ে নেবেন। আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।'

শঙ্কর সামনের গলিতে নেমে ডান দিকে চলে গেল। তার পেছন পেছন সীতাও গেল।

সুজাতার মনে পড়ল, শঙ্কর তখন বলেছিল, বিকেলে বস্তির লোকজনের সঙ্গে তার পরিচয় টরিচয় করিয়ে দেবে। খুব সম্ভব সেই উদ্দেশ্যেই তাকে নিয়ে বেরুতে চাইছে।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সুজাতাকে নিয়ে শঙ্কর বস্তির ডান দিকের শেষ মাথায় একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে। তাদের সঙ্গে সীতাও রয়েছে।

খানিকক্ষণ আগে বিকেল হয়েছে। শেষবেলার হেমন্তের রোদ দ্রুত ঘন হয়ে যাচ্ছে। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। সারা দিনে বোঝা যায় না, কিন্তু বিকেল

হলেই টের পাওয়া যায়, হাওয়ায় হিমের ভাব মিশতে শুরু করেছে। তার মানে শীত খুব দূরে নয়।

ফাঁকা জায়গাটায় এখন প্রচুর লোকজন। বাচ্চাকাচ্চা, বুড়োবুড়ি, যুবক-যুবতী—নানা বয়সের সব মানুষ। দেখেই বোঝা যায়, এরা এই বস্তিরই বাসিন্দা। এদের মধ্যে সেই পোকায় কাটা ছেলেটা অর্থাৎ ঝন্টেকে দেখা গেল।

লোকগুলো সবাই প্রায় এক সঙ্গে কথা বলছিল। ফলে কারো কথাই কেউ শুনতে পাচ্ছে না। গোটা এলাকা জুড়ে একটা তুমুল হৈচৈ আর চিৎকার হচ্ছে শুধু। আর হিন্দি ফিল্মের ভিলেনের মতো মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে উঠছে ঝন্টে, 'থামোস, চেল্লামিল্লি থামাও---' কিন্তু তার কথা কেউ কানেও তুলছে না।

সুজাতার মনে পড়ে গেল, ওবেলা ঝন্টেকে বস্তির লোকদের জড়ো করতে বলেছিল শঙ্কর। বোঝা গেল, সে জন্যই এখানে ভিড় জমেছে। নিশ্চয়ই এখানে তার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দেবে শঙ্কর। ঘরে ঘরে না ঘুরে এভাবে পরিচয় করানোর সুবিধে অনেক। তাতে এক সঙ্গে খুব অল্প সময়ে কাজটা হয়ে যাবে।

একটা ব্যাপার বোঝা গেল, শঙ্করকে এ বস্তির লোকেরা ভয়ও পায় খাতিরও করে। নইলে তার ডাকে এভাবে এখানে হাজির হতো না।

শঙ্কর সামনে গিয়ে হাত তুলতেই সবাই চুপ হয়ে গেল। সে বলল, 'একটা জরুরি কাজে তোমাদের এখানে ডেকেছি।' বলেই সুজাতাকে দেখিয়ে শুরু করল, 'এই দিদিমণি আজ আমাদের বস্তিতে এসেছেন।'

ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ কেউ জানালো, সকালে সুজাতাকে তারা আসতে দেখেছে। তাদের থামিয়ে শঙ্কর বলল, 'ইনি খুব পণ্ডিত মানুষ। এখানে কিছুদিন থাকবেন। এঁর ইচ্ছা, আমাদের বস্তি নিয়ে একটা বই লেখেন। সে জন্যে তোমাদের সাহায্য দরকার।'

বই লেখার ব্যাপার কতটা বুঝল, বস্তির লোকেরাই জানে। তবে হাত নেড়ে নেড়ে সমস্বরে জানালো সুজাতাকে তারা সাহায্য করবে।

শঙ্কর বলল, 'দিদিমণির সামনে এমন কিছু করো না বা বলো না যাতে আমাদের সুনাম নষ্ট হয়। সবসময় তাঁর সম্মান রেখে চলবে।'

ঘাড় হেলিয়ে বস্তির বাসিন্দারা বলল, সুজাতার সম্মান অবশ্যই রাখবে।

এবার সুজাতার দিকে ফিরে শঙ্কর বলল, 'আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ওদের দু-একটা কথা বলুন।'

সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'কী বলব?'

'আপনি এদের কাছে যা চান সেটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিন।'

সুজাতা ভিড়ের কাছে আরো খানিকটা এগিয়ে এসে এভাবে শুরু করল। এই বস্তিতে থাকার সুযোগ পেয়ে এখানকার বাসিন্দাদের বিশেষ করে শঙ্করের কাছে সে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা শঙ্কর জানিয়ে দিয়েছে। সে সম্পর্কে উপকরণ জোগাড় করতে হলে ঘরে ঘরে তাকে যেতে হবে। সবার সঙ্গে কথা বলতে হবে। সুজাতা যা যা জানতে চাইবে অনুগ্রহ করে সকলে যেন তা জানায়। তা হলেই তাকে যথেষ্ট সাহায্য করা হবে। এর বেশি আব কোনো সাহায্যের দরকার নেই।

ভিড়ের ভেতর থেকে একটা ক্ষয়াটে চেহারার ঢ্যাঙা মধ্যবয়সী লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যখন ইচ্ছে, আপনি আমাদের কাছে আসবেন দিদিমণি।'

একটু পরে সভা ভেঙে গেল। লোকজন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগল। সুজাতা এবং সীতাকে নিয়ে শঙ্কর বস্তির দিয়ে এগিয়ে চলল।

যেতে যেতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুজাতা। এই ভিড়, বস্তির মানুষ—কিছুই যেন তার চোখে পড়ছিল না। দুপুরবেলা কোথায় শঙ্কর ওয়াগন দেখতে গিয়েছিল, সেখানে কী হল, ইত্যাদি জানতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ইচ্ছা হলেও সে-সব সম্পর্কে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হল। এ জাতীয় কৌতূহল তার পক্ষে ঠিক না। তবু ভেতরে ভেতরে এই অ্যান্টিসোশাল ছেলেটার জন্য এক ধরনের টেনসন বোধ করতে লাগল সে।

পাশ থেকে শঙ্কর বলে উঠল, 'এবার কাজ স্টার্ট করে দিন ম্যাডাম।'

চমকে উঠে সুজাতা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যত শিগগির শুরু করা যায় ততই ভাল।'

'সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। মনে হয় তাতেই আপনার কাজ চলে যাবে।'

'নিশ্চয়ই।'

একটু চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ শঙ্কর বলল, 'চ্যাটার্জি সাহেবের কাছে শুনেছি, বস্তি ফস্তি নিয়ে আপনি নাকি একটা বই লিখেছেন।'

চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে শঙ্করের দিকে তাকাল সুজাতা। বলল, 'হ্যাঁ।'

'বইটা কি দেখতে পারি?'

'আপনি পড়বেন?'

এক মুহূর্ত থমকে রইল শঙ্কর। তারপর ব্যস্তভাবে বলল, 'না না, আমি না। আমার এক বন্ধু অনেক লেখাপড়া জানে। তাকে দেখাব।'

কি একটু ভেবে সুজাতা বলল, 'একটা কপি আমার সুটকেশে আছে। চলুন, ঘরে গিয়ে দিচ্ছি।'

বস্তিতে ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। সোজা নিজের ঘরে এসে লাইট জ্বালিয়ে সুটকেশ থেকে তার বইটা বার করে শঙ্করকে দিল সুজাতা।

শঙ্কর বলল, 'দু-চার দিন পর ফেরত দিলে অসুবিধা হবে?'

'ওটা ফেরত না দিলেও চলবে। বন্ধুর পড়া হয়ে গেলে আপনার কাছে রেখে দেবেন। আমি যখন থাকব না তখন আমার কথা মনে পড়বে।'

স্থির চোখে সুজাতাকে এক পলক দেখল শঙ্কর। তারপর বলল, 'ঠিক আছে।' দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ফের বলল, 'শুধু আজ না, সন্ধের পর আমার সঙ্গে কোনোদিনই দেখা না হওয়া ভাল।'

'কেন?' খুব অবাক হয়ে গেল সুজাতা।

'রাত্রি হলে চুল্লু ফুল্লু খেয়ে ফ্ল্যাট হয়ে থাকি তো। কোনো কোনো দিন আবার অপারেশনে বেরুতে হয়। তখন আমি বিলকুল পাল্টে যাই। আমার ওপর জানোয়ার ভর করে। যা দরকার, দিনের বেলা আকাশে সূর্য ফুর্য থাকতে থাকতেই বলবেন।'

শঙ্কর আর দাঁড়াল না।

বস্তিতে ফেরার পর সীতা আর এ ঘরে আসে নি, পাশের ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। এবার দু কাপ চা নিয়ে এখানে এল সে। একটা কাপ সুজাতাকে দিয়ে বলল, 'দাদা কোথায়?'

সুজাতা বলল, 'এই তো একটু আগে বেরিয়ে গেল।'

'ওই যা, ওর জন্যে চা নিয়ে এলাম যে।'

'এখন আর তাকে কোথায় পাচ্ছ? তুমিই খেয়ে ফেল। নষ্ট করে কী হবে?'

'দাদাকে নিয়ে আর পারা যায় না।' বলে আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে সীতা।

সুজাতা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সামনের দরজা আর পেছনের জানালার মতো ফোকরটা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ঢুকছে। কোথাও কি আগুন টাগুন লেগেছে? দৌড়ে বারান্দার শেষ মাথায় চলে যায় সে। ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর চোখ যায়, বেলেঘাটার এই বস্তিটা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

দু ফুট দূরের জিনিসও দেখা যায় না।

ধোঁয়া লেগে চোখ জ্বালা করতে লাগল সুজাতার। মনে হতে লাগল, তার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

পেছন থেকে সীতা চেঁচিয়ে ডাকল, 'শিগগির ভেতরে চলে আসুন—'

সুজাতা ঘরে আসতেই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ফ্যান চালিয়ে দিল সীতা। থকথকে ঘন ধোঁয়া ফ্যানের হাওয়ার বাড়ি খেয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

সুজাতা চোখ ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করল, 'এত ধোঁয়া কিসের সীতা?'

সীতা জানালো, এই বস্তিতে প্রায় পাঁচ শো'র মতো ফ্যামিলি রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের ঘরেই এখন রান্নাবান্নার জন্য আঁচ পড়েছে। তাই এত ধোঁয়া। এই ধোঁয়া হওয়ায় মিলিয়ে যেতে কম করে ঘন্টাখানেক লেগে যাবে।

সুজাতার মনে হলো, হিটলারের গ্যাসচেম্বারগুলোও এরকম মারাত্মক আর ভয়াবহ ছিল না।

সীতা আরো জানালো, সন্ধের মতো সকালেও ঘরে ঘরে কয়লার উনুনে আঁচ পড়ে। তখনও গাঢ় ধোঁয়ায় এই বস্তি কিছুক্ষণের জন্য ডুবে যায়।

সুজাতা শিউরে উঠল, বলল, 'রোজ এত ধোঁয়ায় থাকলে ফুসফুসের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। টি. বি হয়ে যেতে পারে।'

টি. বি ব্যাপারটা সীতার জানা আছে। সে বলল, 'এখানকার ঘরে ঘরে টি. বি।'

সুজাতা চমকে ওঠে। আর কিছুর জন্য না হোক, টি. বি-র জন্য অন্তত তার একটা প্রিকশান দরকার।

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর সীতাকে নিয়ে তার ঘরে শুয়েছে সুজাতা। সে খাটিয়ায়, সীতা নিচে। পাশের ঘরে, আজ থেকে যে ক'দিন সুজাতা এখানে আছে, মলিনা একলাই শোবে।

দু'জনের বিছানাতেই মশারি খাটানো রয়েছে। বাইরে লক্ষকোটি মশা পিন পিন আওয়াজ করে ভেতরে ঢোকার জন্য মশারির ফুটো খুঁজছে।

গোটা বস্তি এখন নিঝুম। সন্ধের পর পরই খেয়ে দেয়ে দরজা বন্ধ করে এখানকার বাসিন্দারা শুয়ে পড়েছে। অকারণে কেরোসিন তেল পোড়াবার মতো সৌখিনতা তাদের নেই।

সুজাতার ঘরে কিন্তু মাথার ওপর একশো পাওয়ারের বাল্বটা জ্বলছে, টেবলের ওপর ঘটর ঘটর করে পুরনো ফ্যান একটানা ঘুরে যাচ্ছে।

যেখানে পাঁচশো ফ্যামিলি হেরিকেনের ওপর নির্ভর করে সারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে সেখানে ইলেকট্রিক লাইট জ্বালিয়ে ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগানো হয়তো খুবই মারাত্মক অপরাধ। আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তাকে এতটুকু প্রশ্রয় না দিয়ে এবং সবরকম কষ্টের কথা জেনেশুনেই সে এই বস্তিতে এসেছে। আমেরিকায় যে কমফোর্টের মধ্যে সে থাকে, সেই তুলনায় বেলেঘাটার এই স্লামে সে প্রায় কৃচ্ছ্রসাধনই করছে। জীবনযাপনের দিক থেকে সুজাতা প্রায় এখানকার মানুষের লেভেলে নেমে এসেছে। তবু যে যা ইচ্ছা ভাবুক লাইট আর ফ্যানটা না হলে তার চলবে না। এই দুটো থাকার জন্য সুজাতার মনে হচ্ছে, আধুনিক ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে তার যোগাযোগটুকু এখনও বজায় আছে। নইলে বাকি পৃথিবী থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ সুজাতার মনে পড়ল, এ ঘরে ইলেকট্রিক কানেকশান কিভাবে পেয়েছে, পরিতোষ জানতে চেয়েছিল। কিন্তু শঙ্কর উত্তর দেয় নি। এই মুহূর্তে সীতাকে সেই কথাই

জিজ্ঞেস করল সুজাতা।

সীতা জানালো, কর্পোরেশনের ল্যাম্পপোস্ট থেকে তার লাগিয়ে এ ঘরে লাইট ফ্যানের ব্যবস্থা করেছে শঙ্কর।

সুজাতা বলল, 'এ তো ভীষণ বে-আইনি কাজ।'

সীতা কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় কোথায় যেন প্রচণ্ড আওয়াজে কী সব ফাটতে লাগল।

সুজাতা চমকে উঠল, 'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

সীতা বলল, 'পেটোর।'

'পেটো কী?'

'বোমা।'

প্রথমে একটা দুটো করে ফাটছিল, ক্রমশ তা বাড়তে লাগল। এক সময় মনে হল, বৃষ্টির মতো অনবরত বোমা পড়ছে। মারাত্মক শব্দে বেলেঘাটার এই বস্তি পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাঝে মাঝে দু-এক রাউণ্ড গুলির শব্দও পাওয়া গেল।

সুজাতা ভয়ে ভয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে, বোমাগুলো খুব কাছেই যেন ফাটছে।'

সীতা বলল, 'হ্যাঁ। ওধারেই রেল লাইনে—'

'কারা ফাটাচ্ছে?'

সীতা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর যা বলল তা এইরকম। বস্তির গা ঘেঁষে যে রেল লাইন চলে গেছে সেখানে নানা জায়গা থেকে ওয়াগন বোঝাই হয়ে দামি দামি মালপত্র আসে। এখানকার কিছু লোক অন্ধকারে সে সব ওয়াগান ভেঙে মাল বার করে নিয়ে যায়। রেল লাইনে সারা রাত পুলিশের পাহারা থাকে। ওয়াগন ভাঙতে দেখলেই গার্ডরা তাড়া করে। ওয়াগন ব্রেকাররাও এ জন্য তৈরি হয়েই যায়। তারা বোমা কি পাইপগান চালাতে থাকে। গার্ডরা বেগতিক দেখলে গুলি ছোঁড়ে। এ অঞ্চলে এই বোমাবাজি প্রায় রোজকার ঘটনা।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো শঙ্করের কথাটা মনে পড়ে গেল। শঙ্কর বলেছিল সে ওয়াগন ব্রেকার। সুজাতা খাটিয়া থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল 'তোমার দাদাও এ সবের মধ্যে আছে নাকি?' তাকে খুবই

উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

চাপা বিষণ্ণ গলায় সীতা বলল, 'হ্যাঁ।'

'এ তো খুবই রিস্কের ব্যাপার। যে কোনো সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

'তা তো পারেই। দাদার জন্যে সবসময় মা আর আমি ভয়ে ভয়ে থাকি। কখন যে ওর কী হয়ে যাবে! তখন আমরা একেবারে ভেসে যাব।'

সুজাতা আর কিছু বলল না। সীতাও চুপ করে রইল।

ওদিকে বোমা এবং গুলির আওয়াজ কমতে কমতে একসময় থেমে এল। আরো কিছুক্ষণ বাদে সামনের গলিতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। কে যেন সুজাতাদের ঘরের সামনে দিয়ে ডান দিকে চলে যাচ্ছে। একটু পর ওধারের ঘর থেকে শেকল খোলার শব্দ ভেসে এল। রাত নিঝুম বলে প্রতিটি শব্দের খুঁটিনাটি পর্যন্ত টের পাওয়া যাচ্ছে।

আবছা গলায় সীতা বলল, 'দাদা ফিরে এসেছে। যাক, আজকের দিনটাও কাটল।' বলে বুক ভরে জোরে শ্বাস টানল।

সুজাতার মনে হল, প্রতিটি রাতই শঙ্করের জন্য প্রচণ্ড উদ্বেগে কেটে যায় সীতাদের। তাদের ভয়, যে কোনো মুহূর্তে ভয়াবহ কিছু ঘটে যেতে পারে, পুলিশের গুলি কখন যে তাকে ঝাঁঝরা করে দেবে কে জানে।

সীতা আবার বলল, 'রাত্তিরে দাদা যখন বেরিয়ে যায় তখন থেকেই বুক কাঁপতে থাকে। যতক্ষণ না ফেরে ঘুমোতে পারি না।'

'দিনের পর দিন এভাবে বিপদের ঝুঁকি নেওয়া কোনোভাবেই উচিত না।' বলতে বলতে হঠাৎ উঠে পড়ল সুজাতা। মশারি তুলে সে যখন বেরুতে যাবে সেই সময় সীতা বলে উঠল, 'এ কি, কোথায় যাচ্ছেন?'

'তোমার দাদার সঙ্গে কিছু কথা বলতে হবে। সে যেভাবে চলছে, সেভাবে চলা যে উচিত না সেটা তাকে বোঝানো দরকার।'

দ্রুত উঠে বসল সীতা। ব্যস্তভাবে বলল, 'না না, এখন যাবেন না। রাত্তিরে ওর সঙ্গে দেখা করতে আপনাকে বারণ করেছে। গেলে খুব রেগে যাবে।'

কথাটা ঠিক। শঙ্কর চায় না সূর্যাস্তের পর তার সঙ্গে সুজাতার দেখা হোক। সেই সময়টা চুল্লু না কান্ট্রি লিকার খেয়ে সে নাকি চুর হয়ে থাকে

বা ওই অবস্থায় ওয়াগন ভাঙতে বেরোয়। ইওরোপ-আমেরিকায় প্রচুর ঘাগী মাতাল বা ড্রাগ-অ্যাডিক্ট দেখেছে সুজাতা। এই জাতের লোকেদের সে ভয় পায় না।

কী ভেবে শেষ পর্যন্ত আর বেরুল না সুজাতা। মশারিটা বিছানার ধারে গুঁজে লাইট নিভিয়ে ফের শুয়ে পড়ল। মনে মনে ঠিক করে ফেলল, পরে শঙ্করের সঙ্গে কথা বলবে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ঘুমে চোখ যখন ভারি হয়ে আসছে সেই সময় সুজাতা ডাকল, 'সীতা---- '

সীতা ঘুমোয় নি, তক্ষুণী সাড়া দিল।

সুজাতা বলল, 'কাল সকালেই কিন্তু কাজ শুরু করছি। তোমাকে আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।'

'আচ্ছা।'

॥ এগারো ॥

বেলেঘাটার বস্তিতে একটা রাত কেটে গেল।

পরের দিন সকালে সুজাতার ঘুম ভাঙল পাঁচ শো উনুনের ধোঁয়ায়। পুরো একটি ঘণ্টা দম বন্ধ ঘরে আটকে রইল সে। তারপর ধোঁয়া কাটলে সীতা তাকে বাথরুমে নিয়ে গেল। মুখটুখ ধোয়ার পর তাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে দু'জনের মতো টাটকা আটার রুটি, আলুভাজা এবং চা নিয়ে এল। বোঝা গেল এগুলো তার আর সীতার সকালের ব্রেকফাস্ট।

সুজাতা বলল, 'আমাদের জন্যে আনলে। আর সবাই?'

সীতা বলল, 'মা এত সকালে খায় না। আর দাদা এখনো ঘুম থেকে ওঠে নি। দাদা উঠলে তাকে খাইয়ে মা খাবে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাওয়া চুকিয়ে সুটকেশ খুলল সুজাতা। কাল সারাদিন একটাই শাড়ি পরে কাটিয়েছে সে। ওটা পাল্টানো দরকার। তা ছাড়া নোটবই, ডটপেন, টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি নেওয়াও দরকার। নানাভাবেই সে এই বস্তি জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য রেকর্ড করে নেবে।

প্রথমে নোটবই বার করল সুজাতা। তার পর শাড়িটাড়ি ঘাঁটতে গিয়ে দেখল, সবই অত্যন্ত দামী পোশাক। বেশির ভাগই জিনস, শার্ট, ট্রাউজার্স, দু-একটা সালোয়ার কামিজ। শাড়ি টাড়ি যা আছে, সেগুলোর কোনোটারই দাম পাঁচ সাত শ' টাকার কম নয়। এই বস্তিতে জিনস, শার্ট টার্ট চলবে না। শাড়ি যা আছে সেগুলো পরে গেলে কোনো ভাবেই এখানকার মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশা যাবে না। যেখানে শতকরা একশ জন লোকই পভার্টি লাইনের নিচে কোনোরকমে ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে সেখানে আট শ' হাজার টাকা দামের শাড়ি পরে গেলে তারা তাকে দূরেই সরিয়ে রাখবে, কাছে টেনে নেবে না। কথায় বার্তায়, ব্যবহারে, পোশাকে, খাওয়া দাওয়ায় এদের লেভেলে না নামতে পারলে এখানকার জীবনধারণ পদ্ধতিকে সে ধরতেই পারবে না, তার জানার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যাবে। অন্তত কিছু দিনের জন্য নিজের ক্লাস ক্যারেক্টার ভুলে বস্তিবাসীদের ক্লাসে তাকে মিশে যেতে হবে।

অনিমেষ কাল বলে গেছে, রোজই একবার করে এখানে আসবে। সে এলে তাকে ক'টা সস্তা দামের শাড়ি আর জামা কিনে আনতে বলবে। কিন্তু কখন সে আসবে—সকালে দুপুরে না সন্ধেয়—ঠিক নেই। তার জন্য অপেক্ষা করলে আজ আর হয়তো কাজটা শুরুই করা যাবে না। হঠাৎ কী মনে পড়তে সুজাতা সীতার দিকে ফিরল। বলল, 'তোমার একটা শাড়ি দিতে পার?'

সীতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী হবে?'

'নিয়েই এস না।।'

কিছু না বলে সীতা পাশের ঘর থেকে সস্তা দামের একটা পরিষ্কার প্রিন্টেড শাড়ি নিয়ে এল। তার হাত থেকে শাড়িটা নিতে নিতে সুজাতা বলল, 'ফাইন। তুমি এখন একটু বাইরে যাও। আমি শাড়িটা বদলে নিই। তুমিও রেডি হয়ে এস।'

অসীম বিস্ময়ে সীতা বলল, 'আপনি আমার শাড়ি পরবেন নাকি?'

'হ্যাঁ।' সুজাতা সস্নেহে হেসে বলল, 'ছোট বোনের শাড়ি কি দিদির পরতে নেই? তুমিও আমার শাড়ি পরো?'

একটুক্ষণ হাঁ হয়ে রইল সীতা। সুজাতার উদ্দেশ্যটা আদৌ তার মাথায় ঢুকছে না। বিমূঢ়ের মতো আস্তে আস্তে সে ঘরের বাইরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সুজাতা আর সীতা বস্তির অলিগলি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। দু'জনের কাঁধেই একটা করে ব্যাগ। সুজাতার ব্যাগে নোট বই, টেপ রেকর্ডার, পেন। সীতার ব্যাগে ক্যামেরা, ফ্ল্যাশ লাইট ইত্যাদি। একজনের পক্ষে এত সব বওয়ার অসুবিধা, তাই দু'জনে ভাগাভাগি করে নিয়েছে।

বস্তিটা পুব দিকে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুজাতা। সীতাকে বলল, 'এখান থেকেই শুরু করা যাক, না কি বল?'

সীতা মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

আগে থেকেই সুজাতা ঠিক করে রেখেছে, পুব থেকে প্রতিটি ঘরের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পশ্চিম প্রান্তে চলে যাবে। এ দিকটা শেষ করতে কম করে কুড়ি বাইশ দিন লাগবে। তারপর সে যাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

সুজাতা পুব প্রান্তের শেষ ঘরটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,'এখানে কারা থাকে?'

সীতা জানালো, লক্ষ্মী নামে একটি মেয়ে তার স্বামীকে নিয়ে থাকে।

'ওদের ডাকো।'

সীতার মুখে কিসের ছায়া পড়ল। একটু দ্বিধা করল সে। তারপর বলল, 'লক্ষ্মী মেয়েটা ভাল না।'

'ভাল হোক, খারাপ হোক—সবাইকেই আমার দরকার, ডাকো—'

সীতা আর কিছু না বলে ডাকল, 'লক্ষ্মী—'

একবার ডাকতেই ভেতর থেকে চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি যুবতী বেরিয়ে এল। গোল মুখ তার, মাজা রং, আরক্ত ঘুমন্ত চোখের তলায় কালির পোঁচ, সিঁথিতে বাসি সিঁদুরের শুকনো সরু দাগ, চুল উষ্কখুষ্ক, পরনে ময়লা একটা শাড়ি কোনোরকমে জড়ানো। দেখে মনে হয় বহু রাত ঘুমোয় নি সে। তার ওপর দিয়ে কত কাল ধরে যেন নিয়মিত ঝড় বয়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও তাকে ঘিরে কোথায় যেন একটা আলগা চটক রয়েছে।

এক পলক তার দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে লক্ষ্মী বলল, 'আসুন দিদি, আসুন। এসো সীতা—'

সুজাতা একটু অবাক হয়েই বলল, 'আপনি আমাকে চেনেন নাকি?'

'বা রে, কাল আপনাকে শঙ্করদার মিটিংয়ে দেখলাম না!'

কালকের জমায়েতে অত মানুষের ভিড়ে লক্ষ্মী কোথায় ছিল, সুজাতা মনে করতে পারল না। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এলাম। কিছু মনে করবেন না।'

'বিরক্ত আবার কি। আপনি এসেছেন, এ তো আমাদের সৌভাগ্য।'

লক্ষ্মীর কথাবার্তা ভদ্র ভালো পরিবারের মেয়েদের মতো। মনে হয় না, আজন্ম এরা বস্তিতে কাটিয়েছে।

ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল ভেতরটা অন্ধকার মতো। এক পাশে হাঁড়ি কুঁড়ি পোঁটলাপুটলি, ময়লা কাপড়চোপড়ের ডাঁই। আর আছে পুরনো রং-চটা ট্রাঙ্ক। দেওয়ালে দড়ি টাঙিয়েও খানকতক কাপড়চোপড় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা পুরনো তক্তপোষে ময়লা বিছানা। তেলচিটে বালিশ, ছেঁড়া তোষক থেকে দুর্গন্ধ উঠে আসছে।

তার মধ্যে তালগোল পাকানো মাংসের পিণ্ডের মতো একটা লোক পড়ে আছে। তার দুটো হাতই কনুই থেকে নিচের দিকে কাটা, একটা পা হাঁটু পর্যন্ত আছে, তলার দিকটা নেই। ভাঙা গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। চোখ দুটো ঘোলাটে এবং কম করে ইঞ্চিখানেক গর্তে ঢোকানো। তার তাকানোটা মরা মাছের মতো।

লক্ষ্মী তক্তপোষের তলা থেকে দুটো পুরনো আধভাঙা বেতের মোড়া বার করে বলল, 'বসুন দিদি, বোসো সীতা।' সুজাতারা বসলে হাত-পা কাটা লোকটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তার নাম ধনঞ্জয় বণিক, লক্ষ্মীর স্বামী।

অনেক বিকলাঙ্গ পঙ্গু মানুষ দেখেছে সুজাতা। কিন্তু সে সব দূর থেকে। মাত্র তিন ফুট তফাতে দুর্গন্ধওলা বিছানায় এরকম বীভৎস চেহারার লোকের কাছে আগে আর কখনও বসে নি সে। তার গায়ের ভেতরটা পাক দিয়ে উঠল।

লক্ষ্মী এবার বলল, 'আগেই একটা কথা বলে রাখি, চা কিন্তু খাওয়াতে পারব না দিদি। দু'জনকে চা দিতে হলে পঞ্চাশটা পয়সা বেরিয়ে যাবে। ভীষণ কষ্ট করে আমাকে রোজগার করতে হয়।'

বিব্রত ভাবে সুজাতা বলল, 'না না, আমাদের চায়ের দরকার নেই।'

'বাঁচালেন।'

একটু চুপ। তারপর সুজাতা বলল, 'আমি কেন আপনাদের এখানে এসে আছি, নিশ্চয়ই কাল শুনেছেন।'

লক্ষ্মী মাথা হেলিয়ে জানালো—শুনেছে।

'সে ব্যাপারে আপনার কাছে এলাম। আপনাকে দিয়ে আমার কাজ শুরু হবে।'

'শুরুটা কিন্তু খারাপ হল দিদি।'

'কেন?' রীতিমত অবাকই হয়ে গেল সুজাতা।

লক্ষ্মী বলল, 'আমার মতো নচ্ছার খারাপ মেয়েমানুষকে দিয়ে কেউ শুভ কাজ আরম্ভ করে!'

সুজাতা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। লক্ষ্মীর কথার উত্তর না দিয়ে ব্যাগ থেকে নোটবুক, ক্যামেরা ট্যামেরা বার করতে করতে বলল, 'আপনারা

কতদিন এই বস্তিতে আছেন?'

'বছর পাঁচেক।'

'তার আগে?'

'শ্যামবাজারের একটা ভাল বাড়িতে?'

'এখানে আসতে হল কেন?'

আঙুল বাড়িয়ে ধনঞ্জয়কে দেখাতে দেখাতে বলল, 'ওর জন্যে।'

সুজাতা বিমূঢ়ের মতো এক পলক ধনঞ্জয়কে দেখে বলল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

লক্ষ্মী এবার যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। ক'বছর আগেও ধনঞ্জয়কে নিয়ে ছিল তার ছোট্ট ছিমছাম সুখের সংসার। ওরা তখন থাকত শ্যামবাজারে বড় বড় দু-ঘরের ফ্ল্যাটে। খোলামেলা সেই ফ্ল্যাটটায় চব্বিশ ঘণ্টা জল, অজস্র হাওয়া, প্রচুর আলো। ধনঞ্জয় তখন কাজ করত দমদমের কাছে একটা বড় ফ্যাক্টরিতে। মাইনে ছাড়াও রোজ দু তিন ঘণ্টা করে ওভারটাইম। মাইনে এবং ওভাবটাইম মিলিয়ে যা পাওয়া যেত তাতে দু'জনের সংসারে অভাব বলে কিছু ছিল না। জীবনটা শেষ পর্যন্ত ভালই হয়তো কেটে যেত, কিন্তু আচমকা কারখানায় এক মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টে দুটো হাত আর একটা পা কাটা গেল ধনঞ্জয়ের। আড়াই মাস হাসপাতালে কাটিয়ে যখন সে বেরিয়ে এল তখন প্রাণটুকুই শুধু আছে, বাদবাকি সব গেছে। একটা পঙ্গু হাত-পা-কাটা লোককে কে আর পোষে? চাকরিটা চলে গেল ধনঞ্জয়ের। কোম্পানি থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি আর ক্ষতিপূরণ মিলিয়ে যা পাওয়া গেল তাতে বছর দেড় দুই কোনো রকমে কাটল। তারপর শ্যামবাজারের ফ্ল্যাট ছেড়ে নামতে নামতে তারা বেলেঘাটার এই বস্তিতে এসে ঠেকেছে।

শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছিল সুজাতা। টেপ রেকর্ডারটা চালানোই ছিল, লক্ষ্মীর কথাগুলো তাতে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

লক্ষ্মী বলল, 'একটা কেন, হাজারটা করুন। কিচ্ছু মনে করব না।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না সুজাতা। কিছুক্ষণ পর দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের এখন চলছে কী করে?'

এই কথাটা বলতে এত আটকাচ্ছে?' বলতে বলতে লক্ষ্মীর মুখ শক্ত হয়ে উঠল, ঠোঁট কুঁচকে যেতে লাগল। তীব্র গলায় সে বলল, 'আমার শরীর বেচে সংসার চালাচ্ছি।'

শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না সুজাতা। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

'বুঝতে পারছেন না! আমি বেশ্যা—' বলে তীক্ষ্ণ শব্দ করে হেসে উঠল লক্ষ্মী, 'আমার একটা সিল্কের শাড়ি আছে। বিয়ের শাড়ি। রোজ সন্ধেবেলা সেটা পরে, মুখে পাউডার টাউডার লাগিয়ে ধর্মতলায় চলে যাই। খদ্দের ধরে তাকে খুশি করতে করতে রাত ভোর হয়ে যায়। তারপর ফার্স্ট ট্রামে বস্তিতে ফিরে আসি।'

সুজাতা হকচকিয়ে গেল। দ্রুত একবার ধনঞ্জয়ের দিকে নিজের অজান্তেই তার নিজের চোখদুটো ঘুরল। ধনঞ্জয়ের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। তার মুখের একটা ভাঁজও এদিক ওদিক হল না। মরা মাছের মতো দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে বসে আছে। পৃথিবীর কোনো ব্যাপারেই তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

সুজাতা লক্ষ্মীর দিকে ঘুরে এবার জিজ্ঞেস করল, 'এ লাইনে আপনি এলেন কী করে?'

শব্দ করে হেসে উঠল লক্ষ্মী, 'আপনি তো কলকাতায় থাকেন না। থাকলে জানতেন, গরিব ঘরের মেয়েদের এ লাইনে টেনে নেবার জন্যে কলকাতা জুড়ে হাজার হাজার শকুন ঘুরে বেড়াচ্ছে।' মেয়েমানুষের দালালরা কিভাবে তাকে এই নরকের রাস্তায় টেনে নিয়ে গেছে, সব বলে গেল লক্ষ্মী।

যত শুনছিল ততই দমবন্ধ হয়ে আসছিল সুজাতার। ইওরোপ-আমেরিকায় অনেক বেপরোয়া স্পষ্টবাদী মেয়ে দেখেছে সে, তাদের মুখে কিছুই আটকায় না। কিন্তু লক্ষ্মী তাদেরও ছাড়িয়ে গেছে। বিদেশের কোনো মেয়েই এভাবে এত অকপটে তাদের প্রফেশনের কথা মুখে আনতে পারত কিনা সন্দেহ। লক্ষ্মী ধানাই পানাই করতে শেখে নি। সে যা, তা জানাতে তার এতটুকু সঙ্কোচ নেই। এমন স্পষ্ট সিধে মেয়ে আগে আর কখনও চোখে পড়ে নি সুজাতার। সে বলল, 'আপনার কিরকম রোজগার হয়?'

লক্ষ্মী বলল, 'খারাপ না। মাসে পাঁচ ছ'শ টাকা।' একটু থেমে ফের বলল, 'সবটা খরচ করি না. ভবিষ্যতের জন্যে কিছু জমাই। চিরকাল তো গতরের এই বাঁধুনি থাকবে না. এই চটকও না। না জমিয়ে রাখলে তখন খাব কী?'

সুজাতা উত্তর দিল না।

লক্ষ্মী সামান্য ঝুঁকে বলল, 'সব শুনে ঘেন্না হচ্ছে তো?'

বরং উল্টোটাই হচ্ছে। পঙ্গু স্বামীকে ফেলে যে পালায় নি, তার জন্য নিজের জীবন, সতীত্ব সব কিছু যে স্যাক্রিফাইস করেছে তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। সুজাতা বলল, 'না। আপনার মতো মেয়ে আগে কখনও দেখি নি। চিরকাল আপনার কথা আমার মনে থাকবে। অনেকটা সময় নিয়েছি। এবার আমরা উঠব। আগে আপনাদের দু'জনের একটা ছবি নিতে চাই।'

'নিশ্চয়ই নেবেন।'

'আপনি আপনার স্বামীর পাশে গিয়ে বসুন।'

লক্ষ্মী তক্তপোষে ধনঞ্জয়ের গা ঘেঁষে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার হাতে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। সে বলল, 'ধন্যবাদ।'

লক্ষ্মী বলল, 'জানেন, বিয়ের সময় পাশাপাশি বসে আমরা ছবি তুলেছিলাম। আজ আপনি আবার তুললেন।'

সুজাতা একটু হাসল। তারপর চটপট ক্যামেরা ট্যামেরা ব্যাগে পুরে সীতাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

লক্ষ্মীদের পাশের ঘরটায় থাকে ইউ. পি'র এক ফেরিওলা। নাম ধনিকলাল। বউ আর গোটা পাঁচেক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে তার বিরাট সংসার। কথাবার্তা বলে জানা গেল, ধনিকলাল আনটাচেবল অর্থাৎ অচ্ছুৎ। উত্তরপ্রদেশের গাঁয়েই থাকত তারা। উচ্চবর্ণের বামহনদের সঙ্গে তাদের একবার গোলমাল বাধে। জাতপাতের সওয়ালে ইউ. পি'র বামহনেরা খুবই নির্দয়। তারা ধনিকলালদের গাঁ জ্বালিয়ে দেয়। প্রাণ বাঁচাতে ধনিকলালেরা দেশ ছেড়ে পালায়। নানা জায়গায় ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত তারা বেলেঘাটার এই বস্তিতে এসে উঠেছে। এখানে বছর ছয়েক কেটে গেছে তাদের। ধনিকলাল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাদাম বেচে

বেড়ায়, বউ গোবর কিনে ঘুঁটে বানিয়ে বাড়ি বড়ি বিক্রি করে। এইভাবে জোড়াতাড়া দিয়ে কোনোরকমে তারা টিকে আছে।

ধনিকলাল এবং তার বউ জানকীর প্রতিটি কথা নোটবুকে টুকে নিল সুজাতা, টেপ রেকর্ডারে তাদের গলার স্বর রেকর্ড করল। সবশেষে তাদের ছবি তুলে ডান পাশের ঘরে চলে গেল।

এ ঘর আপাতত বন্ধ। খবর নিয়ে জানা গেল, ওখানে থাকে এক অন্ধ বিহারি ভিখমাঙোয়া বা ভিখিরি এবং তার চোখওলা বউ। সকালবেলা তারা ভিক্ষে করতে বেরিয়ে গেছে। রোজই যায়, ফেরে সন্ধেবেলা। সেই সময় এলে ওদের ধরা যেতে পারে।

ভিখমাঙোয়াদের পাশের ঘরটায় থাকে আর এক বিহারি—রামদেইয়া, তার বউ এবং তাদের তিনটে বাচ্চা। রামদেইয়াবাও অচ্ছুৎ। তারা জাতে দুসাদ। কুশী নদীর পাড়ে তারা থাকত। বাপ-নানার কবজের দায়ে বড় জমিমালিকের ক্ষেতিতে তাকে এবং তার বউকে বেগার দিতে হতো। এতে তার মন একেবারেই সায় দিত না। বিদ্রোহ করে যে বেগার খাটা বন্ধ করবে, তেমন বুকের পাটাও নেই। তা হলে জমিমালিকের লোকেরা তাদের মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। তাই রাতারাতি বউ-বাচ্চার হাত ধরে রামদেইয়া কলকাতায় চলে আসে।

খুটিয়ে খুটিয়ে রামদেইয়ার কাছ থেকে বেগার প্রথা সম্পর্কে যাবতীয় খবর জেনে টুকে নেয় সুজাতা। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'এখানে আপনি কী করেন?'

রামদেইয়া বলে, 'রিকশা চালাই মাঈজি।'

'রোজগার কিরকম হয়?'

'রিকশা তো আমার না। হররোজ মালিককে সাড়ে তিন রুপাইয়া ভাড়া দিয়ে আমার পাঁচ ছগো রুপাইয়া থাকে। তব—'

'তবে কী?'

'সব রোজ তবিয়ত তো ঠিক থাকে না। আমার সাঁসে তখলিক (শ্বাস কষ্ট) আছে। যেদিন তখলিক বাড়ে সেদিন বেরুতে পারি না। না কাম তো না কামাই।'

রামদেইয়া আরো জানায়, তার একার আয়ে এতগুলো পেট চলে না,

তাই তার জেনানাকে লোকের বাড়ি কাজ করতে হয়। এইভাবে কোনোরকমে তারা টিকে আছে।

রামদেইয়ার পড়শি হল বিশ বাইশ বছরেরএকটি মেয়ে—নাম সন্ধ্যা। সে একাই এখানে থাকে।

প্রথম প্রথম নিজের সম্বন্ধে কিছুতেই মুখ খুলতে চাইল না সন্ধ্যা। অনেক বোঝাবার পর চোখ নামিয়ে টুকরো টুকরো ভাবে যা বলল সে সব জোড়া লাগালে এরকম দাঁড়ায়। বছর তিনেক আগে সে থাকত বরানগরে তার মা-বাবার কাছে। অনেকগুলো ভাইবোন নিয়ে তাদের সংসারটা ছিল খুবই অভাবের। বড়বাজারে এক মারোয়াড়ির গদিতে বাবা তিন শ টাকা মাইনের যে চাকরিটা করতো তাতে এতগুলো লোকের দু'বেলার খাওয়া জুটত না।

অভাবী সংসারের যুবতী মেয়েদের যা হয়—তাদের মাংস খাবার জন্য চারপাশে হাঙর যেন ওত পেতে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মেই এরকম এক জানোয়ারের পাল্লায় পড়ে গেল সে। লোকটা এটা সেটা কিনে দিত, রেস্তোরাঁয় খাওয়াত, সিনেমা টিনেমা দেখাত, এইভাবে কিছুদিন চলার পর হঠাৎ তাকে শিয়ালদার এক হোটেলে নিয়ে এল। কপালে সিঁদুর টিঁদুর লাগিয়ে প্রথমে বিয়ের একটা নাটক করল সে। তারপর কিছুদিন ফূর্তি টুর্তি করে তার শাঁসটুকু খেয়ে একদিন উধাও হয়ে গেল। সন্ধ্যার আর বরানগরে ফেরার উপায় নেই তখন। হোটেল থেকে বেরিয়ে নানা ঘাটের জল খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত এই বস্তিতে এসে উঠেছে সে। লক্ষ্মীর মতো সে-ও সন্ধেবেলা সেজেটুজে এসপ্লানেডে চলে যায়। চৌরঙ্গি কি কার্জন পার্কের চারধারে ঘুরে ঘুরে খদ্দের ধরে। শরীর বেচে তাকেও পেট চালাতে হচ্ছে।

নিজের কথা বলতে বলতে সন্ধ্যার চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে থাকে।

সন্ধ্যার ডান পাশের ঘরে যারা থাকে তাদেরও আইনসঙ্গত রোজগারের কোনো রাস্তা নেই। তাদের ফ্যামিলির ছেলেমেয়ে, বাপ-মা, সবাই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়ি এনে কলকাতায় বেচে। এই ভাবেই তাদের পেট চলে।

একটানা দুপুর পর্যন্ত পঁচিশটা ঘর ঘুরে নানা ফ্যামিলির খুঁটিনাটি ইতিহাস এবং নানারকম তথ্য জোগাড় করল সুজাতা। তারপর ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া চুকিয়ে আবার বেরুল।

এবার বিকেল পর্যন্ত ঘুরে ডিটেলে আরো কুড়িটা ফ্যামিলির বিভিন্ন খবর রেকর্ড করল সুজাতা। তারপর ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে আজকের সারা দিনের অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে লাগল।

মাত্র একটা দিনেই তার মনে হয়েছে, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে যেন আলাদা কোন গ্রহে চলে এসেছে।

এখন পর্যন্ত যে পঁয়তাল্লিশটা পরিবার সে দেখেছে তার মধ্যে বাঙালি, বিহারি, ওড়িয়া, নেপালি থেকে উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র এবং মধ্যপ্রদেশের মানুষও আছে। অবশ্য বেশির ভাগই বাঙালি। যে যেখানে থেকেই আসুক, কলকাতার বস্তি কাউকেই ফেরায় না। দুঃখী অভাবী ক্ষুধার্ত মানুষকে সে প্রগাঢ় মমতায় আশ্রয় দেয়।

এতগুলো মানুষের প্রায় কারোই আইনসঙ্গত জীবিকা নেই। সাতটা ফ্যামিলি চলে বেশ্যাবৃত্তির পয়সায়, বারোটা ফ্যামিলির রোজগার চোলাই বা তাড়ি বেচে, তিনটে ফ্যামিলির আয় মেয়েমানুষের দালালি করে, পাঁচটা ফ্যামিলি চলে সাট্টা আর জুয়ার আয়ে। বাদবাকি ভিখিরি, ফেরিওয়ালা, ঠেলা বা রিকশাওলা।

নিজের চোখে কম করে এই বস্তিতে দশ বারোটা কুষ্ঠরোগী দেখেছে সুজাতা। মুখে স্বীকার না করলেও চেহারা দেখে মনে হয়েছে এখানকার অর্ধেক লোকই টি. বি পেশেণ্ট।

থার্ড ওয়ার্ল্ডের প্রসঙ্গ উঠলেই 'পভার্টি লাইন' বলে একটা কথা কত কাল ধরে শুনে আসছে সুজাতা। সেই সীমারেখার অনেক অনেক নিচে, জীবন ধারণের একেবারে শেষ স্তরে বেলেঘাটার এই বস্তি ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে।

॥ বারো ॥

সন্ধের আগে আগে নিজের ঘরে ফিরে আসতেই সুজাতা দেখতে পেল, অনিমেষ বসে আছে। অনিমেষের কথা সারা দিনে একবারও মনে পড়ে নি তার। কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে টেবলে রাখতে রাখতে বলল, 'কখন এসেছ?

অনিমেষ বলল, 'বেশিক্ষণ না, এই মিনিট কুড়ি হবে।' কথা বলছে সে ঠিকই, কিন্তু প্রথম থেকে পলকহীন সুজাতার দিকে তাকিয়ে আছে।

সুজাতা সামান্য অস্বস্তি বোধ করল। বলল, 'ওভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে কী দেখছ?'

'দেখছি সত্যি সত্যি তুমি বেঁচে আছ কিনা।'

মজা করে সুজাতা বলল, 'কী মনে হচ্ছে? বেঁচে আছি না মরে গেছি?'

উত্তর না দিয়ে অনিমেষ বলল, 'শঙ্করের মায়ের মুখে শুনলাম তুমি নাকি সকাল থেকে বস্তির ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছ?'

'ঠিকই শুনেছ।'

'কিরকম লাগছে জায়গাটা?'

'এক কথায় তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমাদের ইকনমিক সিস্টেম মানুষকে কোন স্টেজে নামিয়ে দিয়েছে এখানে না এলে জানতে পারতাম না। যে অভিজ্ঞতা আমার হচ্ছে ঠিকমতো তা যদি ওয়ার্ল্ডের কাছে তুলে ধরতে পারি হোল এ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি চমকে যাবে।'

সীতাও সুজাতার সঙ্গে এ ঘরে ঢুকেছিল। তার ব্যাগটা নামিয়ে রেখে তক্ষুণি সে বেরিয়ে যায়। এখন দেখা গেল দু কাপ চা আর কিছু বিস্কুট নিয়ে আবার সে ফিরে এসেছে। দু'জনের হাতে চায়ের কাপ দিয়ে, বিস্কুটের প্লেটটা টেবলে রেখে সীতা চলে গেল।

কালচে রঙের বিদঘুটে চায়ের দিকে তাকিয়ে নাকমুখ কুঁচকে গেল অনিমেষের, 'হরিবল! এ জিনিস খেলে সার্টেন ডেথ।'

ততক্ষণে চায়ে চুমুক দিয়েছে সুজাতা। দ্রুত ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সে বলল, 'নো ব্যাড কমেন্ট প্লিজ। আদর করে দিয়েছে, না খেতে পারলে খেও না। কিন্তু বাজে কথা বলতে পারবে না। দে উইল বি হার্ট।'

বিস্বাদ পাঁচন গেলার মতো ঢক করে সবটুকু এক চুমুকে গিলে কাপটা নামিয়ে রাখল অনিমেষ। আর তখনই সামনের দরজা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ঢুকতে লাগল। চমকে সে বলল, 'কী ব্যাপার, এত ধোঁয়া!'

সুজাতা উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। তারপর ফ্যানটা চালিয়ে ফের এসে বিছানায় বসল। বলল, 'ও কিছু না। রান্নার জন্যে আঁচ পড়ছে।'

'রোজই এরকম ধোঁয়া হয় নাকি?'

'রোজ, দু'বেলা। খেতে হলে উনুন তো জ্বালাতেই হবে।'

'এক্ষুণি তুমি আমার সঙ্গে চল।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অনিমেষ।'

'কোথায় যাব!' রীতিমত অবাকই হল সুজাতা।

আমাদের বাড়িতে।'

'কেন?'

'এখানে থাকলে তুমি মরে যাবে।'

কালও বস্তিতে ঢোকার পর প্রায় একই কথা বলেছিল অনিমেষ। সুজাতা বলল, 'মরব না। ডোণ্ট ওরি। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে যাচ্ছি না।'

অনিমেষ বুঝতে পারল, সুজাতাকে কোনোভাবেই টলানো যাবে না।

ঘটর ঘটর করে ফ্যান চলছে। হাওয়ার ধাক্কায় পেছনের দেওয়ালের ফোকর দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে অনিমেষ.বলল, 'তুমি চলে আসার পর আমাদের বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। মা আর বাবা সব সময় তোমার কথা বলছেন।'

সুজাতা বলল, 'আঙ্কল আর আন্টি আমাকে খুব স্নেহ করেন। বলবেই তো।' একটু থেমে বলল, 'কেমন আছেন আঙ্কল?'

'ওই একই রকম।'

একটু চুপ করে থেকে অনিমেষ আবার বলল, 'তুমি না থাকায় আমারও ভীষণ খারাপ লাগছে।'

সুজাতা উত্তর দিল না, চোখের কোণ দিয়ে অনিমেষকে এক পলক দেখল শুধু।

অনিমেষ বলতে লাগল, 'ক'টা দিন তোমাকে নিয়ে সকাল থেকে ঘুরেছি। তুমি চলে এলে। মনে হচ্ছে আমার যেন আর কোনো কাজ নেই।

পুরোপুরি বেকার।'

সুজাতা বলল, 'কেন অফিসে যাচ্ছ না?'

'আজ থেকে যাচ্ছি কিন্তু কিছু করতে ইচ্ছে করে না। তুমি আমার অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছ।'

সুজাতা হাসল, 'ক'দিন একটা মেয়েব সঙ্গে ঘুরে অভ্যাস খারাপ করে ফেললে! সিম্পটম ভাল মনে হচ্ছে না।'

একটুক্ষণ সুজাতার দিকে তাকিয়ে রইল অনিমেষ। তারপর বলল, 'তুমি হয়তো ঠাট্টা করছ। কিন্তু যা সত্যি তাই বললাম।'

অনিমেষ যে রকম ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে বা তার গলার স্বর যেভাবে গাঢ় হচ্ছে তাতে তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরই সুজাতা ভেবে রেখেছিল, একটা বিশেষ সীমারেখা পর্যন্ত এগুতে দেবে। ঠাট্টা, মজা বা বন্ধুত্ব—এই পর্যন্তই বাউণ্ডারি লাইন। কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। হঠাৎ কী মনে পড়তে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে। বলল, 'তুমি আবার কবে আসছ?'

অনিমেষ সামান্য আহত হল যেন। বলল, 'কালই তো বলে গেলাম, রোজ আসব। ভুলে গেছ?'

'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। তা হলে প্লিজ কাল আসার সময় সস্তা দামের তিন চারটে প্রিণ্টেড শাড়ি কিনে এনো। তিরিশ চল্লিশ টাকার বেশি কোনোটার যেন'দাম না হয়।' বলে ব্যাগ খুলে টাকা বার করল সুজাতা, 'এই নাও—'

টাকাটা নিল না অনিমেষ। বলল, 'আগে তো আনি। টাকা পরে দিও। কিন্তু—'

'কী?'

'অতগুলো বাজে কাপড় দিয়ে কী হবে? কাউকে দেবে?' বলতে বলতে হঠাৎ সুজাতার পরনের শাড়িটার ওপর অনিমেষের চোখ আটকে গেল। প্রায় আঁতকেই উঠল সে। এরকম একটা খেলো কাপড় যে সুজাতা গায়ে তুলতে পাবে তা যেন ভাবা যায় না। সে বলল, 'এটা কী পরেছ? কার শাড়ি?'

'সীতার।' সেই যে সকালে সীতার শাড়ি পরে সুজাতা বেরিয়েছিল

সেটা আর পাল্টানো হয় নি।

বিমূঢ়ের মতো অনিমেষ জিজ্ঞেস কবল, 'সীতার শাড়ি পরেছ কেন?'

কেন পরেছে, কেনই বা সস্তা শাড়ি কিনে আনতে বলছে, এ সব বোঝাতে গেলে প্রচুর বকতে হবে। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর এত এনার্জি সুজাতার নেই। সে শুধু বলল, 'শখ হয়েছিল, তা-ই।'

এ নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না অনিমেষ। একটু ভেবে বলল, 'তুমি এখানে এসেছ। আমরা সব সময় দারুণ অ্যাংজাইটির মধ্যে থাকছি।'

'কেন?'

'এখানকার মানুষগুলো তো ভাল না। সব ইনহিউম্যান—বিস্টস। কখন যে তোমার কি ক্ষতি হয়ে যাবে।'

আগেও এ জাতীয় কথা বলেছে অনিমেষ। সুজাতা বলল, 'এখানকার লোকজন সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। তারা হানড্রেড পার্সেন্ট মানুষই।'

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর আসল প্রসঙ্গে চলে এল অনিমেষ। বলল, 'আমার কথাটা মনে আছে?'

মুহূর্তে বুঝে নিল সুজাতা। বলল, 'আমেরিকার ব্যাপার তো?'

'হ্যাঁ। কিছু ভাবলে?'

'এখনও সেভাবে কিছু ভাবি নি। এখানকার কাজটা শেষ করে নিই। তারপর কিছু একটা করা যাবে।'

কিছুটা ইতস্তত করে অনিমেষ বলল, 'যদি কিছু মনে না কর, একটা রিকোয়েস্ট করি—'

'কী রিকোয়েস্ট?' অনিমেষের চোখের দিকে তাকাল সুজাতা।

'তোমার জানাশোনা যে সব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক আমেরিকায় রয়েছে তাদের কাছে আমার ব্যাপারে যদি চিঠি লিখে দাও—' বলতে বলতে থেমে গেল অনিমেষ। সুজাতার দিকে তাকিয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগল।

একটু চিন্তা করে সুজাতা বলল, 'ঠিক আছে—লিখব।'

দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠল অনিমেষ। বলল, 'কালই এনভেলপ টেলপ নিয়ে আসব।'

এদিকে ধোঁয়া কেটে গিয়েছিল। সুজাতা দরজা খুলে দিল।

অনিমেষ আর বসল না। একসময় উঠে পড়ল। বলল, 'আজ চলি।'

অনেক রাত্রে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে নোটবই খুলে বসেছে সুজাতা। সারাদিনে পঁয়তাল্লিশটা ফ্যামিলির যেসব ইতিহাস বা তথ্য জোগাড় করেছে সেগুলো দেখতে লাগল সে। দ্রুত লেখার ফলে অনেক জায়গায় ফাঁক থেকে গেছে। সে সব ঠিকঠাক করে নিতে হবে।

মেঝেতে বিছানা করে শুয়েছে সীতা। এখনও সে ঘুমোয় নি। কিছুক্ষণ পর পরই সুজাতার চা বা জল টল দরকার কিনা, জিজ্ঞেস করছে।

হঠাৎ নিঝুম রাতকে চমকে দিয়ে দূরে রেল লাইনে বোমাবাজি শুরু হল। বৃষ্টির মতো একটানা বোমা পড়ছে। সেই সঙ্গে ফায়ারিংয়ের আওয়াজ।

নিচে হকচকিয়ে উঠে বসল সীতা। ভয়ার্ত গলায় বলল, 'আজও গোলমাল হচ্ছে. দাদাটার যে কী হবে।'

সুজাতা আর পড়তে পারছিল না। নোটবুকটা বন্ধ করে রুদ্ধশ্বাসে বসে রইল সে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, আজ সারাদিনে একবারও শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয় নি।

কালকের মতোই অনেকক্ষণ একটানা বোমা আর গুলির শব্দ শোনা গেল। তারপর সব চুপচাপ।

একসময় সামনের গলিতে পায়ের আওয়াজে টের পাওয়া গেল, শঙ্কর ফিরে এসেছে।

॥ তেরো ॥

বেলেঘাটার এই বস্তিতে আরো পাঁচটা দিন কেটে গেল সুজাতার। এর মধ্যে পরিতোষ একবার এসে তার খোঁজ নিয়ে গেছে। ও.সি সরকারের পক্ষে রোজ আসা সম্ভব হয় নি, কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে তিনদিন এসেছে। তবে নিয়মিত প্রতিদিন বিকেলে অফিস ছুটির পর এখানে চলে আসছে অনিমেষ। তার উদ্দেশ্যটা ক্রমশ বেশি করে স্পষ্ট হচ্ছে। তার তাকানো, কথা বলাব ভঙ্গি—সব কিছুর মধ্যে একটাই ইঙ্গিত লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু অনিমেষ সম্পর্কে মনে মনে অনেক আগে থেকেই বাউন্ডারি লাইন টেনে রেখেছে সুজাতা। সেটা কিছুতেই তাকে পেরুতে দেবে না সে।

আমেরিকায় চিঠি লেখার জন্য অনেকগুলো এনভেলপ দিয়ে গেছে অনিমেষ এবং রোজই এ ব্যাপারে তাগাদা দিচ্ছে। চিঠি এখনও লেখা হয় নি, তবে যেভাবে চাপ আসছে তাতে লিখতে হবে বলেই মনে হচ্ছে।

কথামতো সস্তা খেলো ক'টা শাড়িও দিয়ে গেছে অনিমেষ। কিছুতেই সে দাম নেবে না, একরকম জোর করেই টাকাটা তাব পকেটে গুঁজে দিয়েছে সুজাতা। আপাতত সেই সব শাড়ি পরেই সে বস্তিতে ঘুরে বেড়ায়।

অনিমেষের কাছে ওদের বাড়ির নতুন একটা খবর পাওয়া গেছে। অশোক এবং মঞ্জিরাকে নিয়ে প্রবলেম তো ছিলই। অনিমেষের দিদি শ্রাবণী আরো মারাত্মক সমস্যা নিয়ে ক'দিন আগে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। সে আর স্বামীর কাছে ফিরবে না।

শ্রাবণীর ব্যাপারে আগেই একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল অনিমেষ। তবে পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। এবার তার প্রবলেমটা জানা গেল। তার কনট্রাক্টার স্বামী নিরুপম বড় বড কনট্রাক্ট ধরার জন্য মোটা টাকা ঘুষ তো দেয়ই, মাঝে মাঝে মেয়েও সাপ্লাই করতে হয় তাকে। নিরুপমের ইচ্ছা, শ্রাবণী সুন্দব সুন্দর মেয়ে জোগাড় করে তার বিজনেসে সাহায্য করুক। কিন্তু ববীন্দ্র সঙ্গীত জানা, কম্পারেটিভ লিটারেচারের ছাত্রী শ্রাবণী মেয়ে প্রকিওর কবাব কথা ভাবতেও পারে না। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ভেতর প্রচণ্ড গোলমাল। নিরুপমকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে সে। অনেক ঝাগড়াঝাঁটি, অশান্তি এবং টেনসনের পর শেষ পর্যন্ত শ্রাবণী অনিমেষদের কাছে চলে এসেছে। ওই রকম জঘন্য

টাইপের লোকের ঘর আর করবে না। দু-চার দিনের মধ্যে ডিভোর্সের মামলা আনবে সে। সে জন্য অ্যাডভোকেটের বাড়ি ছোটাছুটি করছে।

শুনতে শুনতে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল সুজাতার। সেই ডকুমেন্টারি ছবির আমেরিকান ডিরেক্টর তাকে বলেছিল, কলকাতার স্লামে হিউম্যান ভ্যালুজ বলতে কিছুই নেই। কিন্তু সুজাতার সংশয়, এখানকার হায়ার সোসাইটিতেও কি তার ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট আছে?

এ ক'দিনে মোটামুটি মসৃণভাবেই বস্তিতে সুজাতার কাজ এগিয়ে গেছে। প্রায় দেড়শ ফ্যামিলির ইন্টারভিউ নিয়েছে সে, প্রথম দিকে অবশ্য দু-চারটে ফ্যামিলি নিজেদের সম্বন্ধে মুখ খুলতে চায় নি। তাদের ভয়, বলে বিপদে না পড়ে যায়। পরে অবশ্য সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে। এই সব ইন্টারভিউ থেকে কলকাতার বস্তিবাসীদের আর্থিক সামাজিক এবং ধর্মীয় ইতিহাসের একটা ছবি তার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই ক'দিনে শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়েছে মাত্র বার তিনেক। পাঁচ মিনিটের বেশি কোনো বারই কথা হয় নি। সুজাতা কেমন আছে, তার কাজ কিরকম চলছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করেই সে চলে গেছে।

রোজ ঘুম থেকে উঠে চা-টা খেয়েই সীতাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুজাতা। দুপুরে ফিরে খেয়েদেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে, তারপর আবার বেরোয়। এবার ফিরতে ফিরতে বিকেল। মোটামুটি এই হচ্ছে তার প্রতিদিনের রুটিন।

কিন্তু আজ আর বেরুনো হল না সুজাতার। সকালে উঠেই টের পেল, মাথাটা ভার ভার লাগছে। গলার কাছে বেশ ব্যথা, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। গায়ে টেম্পারেচারও রয়েছে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। তার কাছে সব সময়ই ঘুমের এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার ট্যাবলেট থাকে। একটা ট্যাবলেট খেয়ে সে সীতাকে বলল, 'শরীরটা ভাল লাগছে না, আজ আর বেরুব না।'

সীতাকে চিন্তিত দেখায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?'

এ ক'দিন সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকার ফলে তার ওপর কেমন যেন মায়া

পড়ে গেছে মেয়েটার। সুজাতা বলে, 'অল্প একটু জ্বর।'

সীতা ভাসা ভাসা শুনেছে, সুজাতারা বিরাট বড়লোক। সুদূর বিদেশে প্রচুর আরামে সে থাকে। বস্তির জঘন্য পরিবেশে এভাবে থাকার অভ্যাস তার নেই। সুজাতা যে এত কষ্ট করে এখানে আছে, এটা যেন সীতারই লজ্জা। কিসে তার কষ্ট কম হবে, কী করলে তার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে—এ সব দিকে সবসময় তার তীক্ষ্ণ নজর। জ্বরের কথা শুনে সীতা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বলে, 'দাদাকে বলে ডাক্তার ডেকে আনব?'

সুজাতা বলে, 'কিচ্ছু করতে হবে না। আমি ফ্লুর ট্যাবলেট খেয়েছি। একদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।' একটু ভেবে বলে, 'রোজই তো আমার সঙ্গে বেরুচ্ছ। মাকে একা একা সব কাজ করতে হচ্ছে। আজ ওঁকে একটু সাহায্য কর গিয়ে।'

একটু চুপ করে থাকে সীতা। তারপর বলে, 'আচ্ছা।'

সীতা চলে যাবার পর খানিকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইল সুজাতা। তারপর টেবল থেকে নোটবুকটা নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে ইন্টারভিউগুলো দেখতে লাগল। একসময় নোটবুকটা রেখে টেপ চালিয়ে বস্তিবাসীদের গলা শুনল। শুনতে শুনতে ভাবল, স্লাম নিয়ে বই তো লিখবেই, তা ছাড়া আমেরিকার নানা ইউনিভার্সিটিতে এ নিয়ে অডিও-ভিসুয়াল সেমিনারও করা যেতে পারে। টেপ চালিয়ে ইন্টারভিউগুলো ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন করে দিলেই হবে। এখানকার লোকজনের ছবিও তোলা আছে। অবশ্য সেগুলো স্টিল ফোটোগ্রাফ। অনিমেষ বা পরিতোষকে দিয়ে একটা মুভি ক্যামেরা খুব শিগগিরই আনিয়ে নেবে। সুজাতা মুভি ক্যামেরা চালাতে জানে। চলমান ছবির সঙ্গে, ইন্টারভিউ এবং কমেন্টারি মিলিয়ে ব্যাপারটা ভালই দাঁড়াবে মনে হয়। ভাবনাটা মাথায় আসতেই বেশ উত্তেজনা বোধ করল সুজাতা।

হঠাৎ টেপ রের্কডার বন্ধ করে উঠে পড়ল সুজাতা। যদিও ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় তবু তার স্বভাবটা ছটফটে ধরনের। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে বা শুয়ে থাকতে পারে না।

টেবলে তার ঘড়িটা রয়েছে। সেটা তুলে সময়টা দেখে নিল সুজাতা। দশটা আঠার। বেরুলে এতক্ষণে চার পাঁচটা ফ্যামিলির ইন্টারভিউ নিতে

পারত। তার কাজ বেশ খানিকটা এগিয়ে যেত।

এই ছোট চাপা ঘরে একা একা আর ভাল লাগছে না সুজাতার। ঘড়িটা হাতে পরে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এল সে। ছ'সাত দিন হল এখানে এসেছে। এর মধ্যে শঙ্করদের অন্য ঘর দুটোতে যাওয়া হয় নি। সে ঠিক করে ফেলল, ওখানে গিয়ে সীতা আর মলিনার সঙ্গে গল্প করবে। বিশেষ করে মলিনার সঙ্গে। সীতা তো সর্বক্ষণ তার কাছেই থাকে। মলিনার সঙ্গে দু বেলা খাবার সময়টুকু ছাড়া দেখাই হয় না।

পাশের ঘরে এসে সুজাতা দেখল, মলিনা রান্না করছে। উনুন থেকে লঙ্কা ফোড়নের উগ্র ঝাঁঝ উঠে আসছে। সীতাকে কোথাও দেখা গেল না।

সুজাতা যে এখানে চলে আসবে, মলিনা ভাবতে পারে নি। সে ভীষণ ব্যস্ত এবং বিব্রত হয়ে পড়ল, 'সীতার কাছে শুনলাম, আপনার জ্বর।'

'ও কিছু না—' বলতে বলতে মলিনার কাছে মেঝের উপর বসে পড়ল সুজাতা, 'ঘরে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। তাই চলে এলাম।'

'এ কি, নোংরা ময়লার ওপর বসে পড়লেন! দাঁড়ান একটা কিছু পেতে দিই।'

'দরকার নেই। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'কিন্তু এই আগুনের তাতে আপনার খুব কষ্ট হবে।'

'কিছু হবে না।'

মলিনার রান্না দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ এলোমেলো কথা বলল সুজাতা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সীতাকে তো দেখছি না। কোথাও গেছে?'

সুজাতা বলল, 'শঙ্করের ঘরে রয়েছে।'

প্রথম দিন ছাড়া শঙ্করের সঙ্গে ভাল করে কথাই হয় নি সুজাতার। সে মস্তান, সমাজবিরোধী, দাগী ক্রিমিনাল। তার কথাবার্তা রুক্ষ, চোয়াড়ে, কাটা কাটা। এ সবই ঠিক। তা সত্ত্বেও শঙ্করের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। তার সম্বন্ধে সুজাতা যা জেনেছে সেটুকুই যেন যথেষ্ট নয়। তাকে ঘিরে আরো কিছু আছে। এখন তাকে পাওয়া গেলে ভালই হবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করবে সুজাতা। শঙ্কর

সম্পর্কে হঠাৎ সে প্রবল আগ্রহ বোধ করতে থাকে। সুজাতা কলকাতায় আসার পর জেনেছে বাঙালিরা নামের সঙ্গে 'বাবু' জুড়ে অন্যকে সম্ভ্রম বা সম্মান জানায়। সে জিজ্ঞেস করল, 'শঙ্কর বাবু কি তাঁর ঘরে আছেন?'

মলিনা বলল, 'না, সেই কোন ভোরে বেরিয়ে গেছে।'

একটু যেন হতাশই হল সুজাতা। তারপর বলল, 'যাই, সীতা কী করছে একটু দেখে আসি।' মলিনা কিছু বলার আগেই সে উঠে ডান পাশের ঘরে চলে যায়।

বস্তির অন্য সব ঘর থেকে শঙ্করের ঘরটা আলাদা কিছু নয়। একধারের দেয়াল ঘেঁষে তিন পা-ওলা একটা তক্তপোষ, বাকি পা'টা ইট সাজিয়ে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার ওপর পরিষ্কার বিছানা। আরেক ধারে একটা সস্তা খেলো কাঠের পাল্লাভাঙা আলমারিতে অজস্র বই। মেঝেতেও বইয়ের স্তূপ। আলমারির মাথা থেকে হ্যাঙ্গারে গোটাকয়েক জামা আর ফুলপ্যান্ট ঝুলছে।

অন্য কোনো কারণে না, একজন অ্যান্টিসোশাল ওয়াগন ব্রেকারের ঘরে এত সব বই দেখে অবাক হয়ে যায় সুজাতা। এমন বিস্ময় যে তার জন্য অপেক্ষা করছিল, এ ঘরে ঢোকার আগে ভাবা যায় নি।

সীতা কোমরে শাড়ি গুঁজে মেঝের বই টই গোছাচ্ছিল। হঠাৎ সুজাতাকে এ ঘরে দেখে সে-ও কম অবাক হয় নি। সে বলল, 'আপনি!'

সুজাতার চোখ বইগুলোতে নিবদ্ধ। অন্যমনস্কের মতো সে বলল, 'চলে এলাম। কী করছিলে তুমি?'

সুজাতা এগিয়ে এসে আলমারি এবং মেঝের বইগুলো দেখতে লাগল। বেশির ভাগই ইকনমিকস আর সোসিওলজির বই। সে বলল, 'এ সব বই কার?' বলেই খেয়াল হল, প্রশ্নটা বোকার মতো করে ফেলেছে। এ ঘরে কার বই থাকতে পারে, সেটা বোঝা উচিত ছিল। আসলে একটা সমাজবিরোধীর ঘরে অর্থনীতি আর সমাতত্ত্বের বই সে আশা করে নি।

সীতা বলল, 'সবই দাদার বই।'

'নিজের?'

'হ্যাঁ, নিজেরই তো। দাদা অনেক লেখাপড়া জানে। সময় পেলে এখনও এই সব বই টই পড়ে।'

কথা বলতে বলতে বই ঘাঁটতে লাগল সুজাতা। আলমারি বা মেঝে থেকে একটা করে বই তুলে নেয়, দু'চার পাতা ওল্টায়, তারপর ফের যত্ন করে জায়গামতো রেখে দেয়। সে লক্ষ করেছে, প্রতিটি বইয়েরই প্রথম পাতায় লেখা আছে—শঙ্কর সরকার। বি. এ ফোর্থ ইয়ার, ইকনমিকস অনার্স। কলকাতার একটা কলেজের নামও লেখা আছে তলায়।

ইকনমিকসে অনার্স নিয়ে যে পড়েছে সে কি করে অ্যান্টিসোশাল হয়ে দাঁড়াল, তা যেন ভাবা যায় না। শঙ্করের এই পরিণতি একই সঙ্গে ভয়াবহ ও বিস্ময়কর।

বইয়ের গাদার ভেতর আচমকা নিজের বইটা আবিষ্কার করে ফেলে সুজাতা। বন্ধুর নাম করে তা হলে নিজেই পড়তে এনেছে শঙ্কর। দূরমনস্কর মতো দু-চার পাতা ওল্টাতেই চমক লাগে তার। প্রায় সব পাতারই মার্জিনে লাল ডট পেনে ইংরেজিতে মন্তব্য লেখা রয়েছে। সেগুলো তর্জমা করলে এরকম দাঁড়ায়। 'লেখিকার বস্তি সম্পর্কে ধারণা বিশেষ নেই।' বা 'সমস্যার বাইরের স্তরেই ঘুরে বেড়িয়েছেন, আসল জায়গায় পৌঁছুতে পারেন নি।' কিংবা 'ইওরোপ-আমেরিকাকে এই বই লিখে নাচানো যাবে কিন্তু যারা বস্তিবাসীদের সমস্যার কথা জানে তাদের কাছে এ বই হাস্যকর।' ইত্যাদি ইত্যাদি। পড়তে পড়তে কান লাল হয়ে ওঠে সুজাতার। সারা পৃথিবী তার রিসার্চ ওয়ার্ক নিয়ে মাতামাতি করেছে। সে জানে এ বইতে অনেক ফাঁকি এবং সেই সঙ্গে ভালো ব্যাপারও আছে। তাই বলে বস্তির একটা ছোকরা—অনার্স টনার্স যা-ই পড়ুক না—তার তিন চার বছরের রিসার্চকে টুসকি মেরে উড়িয়ে দেবে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সুজাতার সূক্ষ্ম অহঙ্কারে প্রচণ্ড ঘা লাগে। শঙ্করকে সে সহজে ছেড়ে দেবে না। এই সব কমেন্টের পেছনে কী কী কারণ বা লজিক আছে, সোজাসুজি জিজ্ঞেস করবে।

বইটা আগের জায়গায় রেখে সুজাতা বলল, 'আমি এখন যাই সীতা।'

'আচ্ছা।' সীতা জানালো, ঘর গোছানো হয়ে গেছে। এবার ঝাঁটা দিয়ে মেঝেটা পরিষ্কার করবে। তাতে প্রচুর ধুলো ময়লা উড়বে। সুজাতার এখন না থাকাই ভালো।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে সুজাতা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি যে এখানে

এসেছিলাম, তোমার দাদাকে বলো না।'

'কেন?'

'এমনি। ওঁকে না জানিয়ে হঠাৎ এসে পড়েছি তো। বললে কিছু মনে করতে পারেন।'

কী ভেবে সীতা মাথা সামান্য হেলিয়ে দিল, 'ঠিক আছে, বলব না।'

সুজাতা সোজা নিজের ঘরে চলে এল।

দুপুরে আজ আর ভাত খায় নি সুজাতা। মলিনা ক'টা আটার রুটি বানিয়ে দিয়েছিল। তাই খেয়ে শুয়ে পড়েছে সে।

সীতা আর মলিনা রোজকার মতো এখানে বসেই দুপুরের খাওয়া সেরেছে। তারপর এঁটো বাসনকোসন নিয়ে দু'জনেই চলে গেছে।

সীতা অন্য দিন আঁচিয়েই ঐ ঘরে চলে আসে। আজ এখনও তাকে দেখা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব হাতে হাতে মলিনার সঙ্গে কোনো কাজটাজ করছে।

এখন ঠিক দুপুরও না, আবার বিকেলও না। দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় সময়টা থমকে আছে।

সুজাতা শুয়ে শুয়ে অলস আঙুলে নোটবুকের পাতাগুলো উল্টে যাচ্ছিল। দুপুরে তার কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না।

হঠাৎ বাইরে থেকে শঙ্করের গলা ভেসে এল, 'আসতে পারি ম্যাডাম—'

ব্যস্তভাবে উঠে বসল সুজাতা, 'আসুন, আসুন—'

শঙ্কর ঘরে ঢুকে কিছু বলার আগেই একমাত্র চেয়ারটায় বসে পড়ল। সুজাতা লক্ষ করল, শঙ্করের হাতে তার সেই বইটা রয়েছে। তার মুখচোখের ভাব একটু শক্ত হল।

শঙ্কর বলল, 'শুনলাম, আপনার জ্বর ফর হয়েছে।'

'ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো।'

'তাই বলুন। সীতা আর মা তো হেভি ঘাবড়ে গেছো। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন?'

'কী?'

'আপনারা টেরিফিক বড়লোক। একটু হাঁচলে লোকে ভাবে কী না

জানি হয়ে গেছে। আমাদের ক্যানসার হলেও কেউ ফিরে তাকায় না।'

তার বলার ধরনে হেসে ফেলল সুজাতা। হালকা গলায় বলল, 'জ্বরের খবর পেয়ে তবু এলেন। সাত দিন এসেছি, আপনাকে তো দেখতেই পাই না। গেস্টের মনে কষ্ট দেওয়া কিন্তু ঠিক না।'

'কী করব বলুন। পুওর ম্যান। পেটের ধান্দায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চরকিবাজি করতে হয়।' বলে একটু হাসল শঙ্কর। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'এই নিন আপনার বই। আমাব বন্ধুর পড়া হয়ে গেছে।'

স্থির চোখে একপলক শঙ্করকে লক্ষ করল সুজাতা। তারপব বলল, 'বইটা বন্ধুর কেমন লেগেছে?'

'শুনলে মন খারাপ হয়ে যাবে।'

'তবু বলুন।'

'বন্ধু বলল, বইটা রাবিশ। যে লিখেছে তার নাকি থার্ড ওয়ার্ল্ডেব বস্তি ফস্তি সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নেই।'

সুজাতা একটুও চমকাল না। এ সবই তার জানা। সে জিজ্ঞেস কবল, 'আর কী বললেন আপনার বন্ধু?'

'অন্যের বই ফই পড়ে সেখান থেকে মাল হাতিয়ে এই টাইপের বই লেখা উচিত না। এই যে ধরুন, আপনি এখানে এসেছেন, কত কষ্ট করে থাকছেন। এখান থেকে আমেরিকায় গিয়ে কলকাতার বস্তির ওপর একখানা টেরিফিক বই মার্কেটে ঝেড়ে হোল ওয়ার্ল্ডের চোখ ট্যারা কবে দেবেন। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'এভাবে ওসব কারবার হয় না।'

সুজাতা বুঝতে পারছিল বন্ধুর নাম করে বললেও আসলে নিজের অজান্তে শঙ্কর একটু একটু করে ধরা দিচ্ছে। তাকে একটুও বুঝতে না দিয়ে সুজাতা বলল, 'এভাবে হয় না মানে? আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

শঙ্কর বলল, 'মানে, এই যে দু-তিন মাস আমাদের বস্তিতে থেকে শখের কষ্ট করে একটা বই লিখবেন—স্লামের প্রবলেম এতো সিম্পল না।'

সুজাতা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, 'আপনার মতে এখানকার প্রবলেম ধরতে হলে কী করা দরকার?'

'বছরের পর বছর এখানে পড়ে থাকতে হবে। শুধু তাই না, কলকাতার বস্তিতে মানুষের জীবন যেখানে পৌঁছেছে তা বুঝতে হলে স্বাধীনতার আগের বৃটিশ কলোনিয়াল ইকনমিক পলিসি থেকে স্টার্ট করে সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার, কমুনাল রায়ট, ফেমিন, পার্টিশান, স্বাধীন ভারতের মিক্সড ইকনমি—সব মিলিয়ে আমাদের দেশের সোসিও-ইকনমিক আর সোসিও-পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ডটা ভাল করে বুঝতে হবে। নইলে আসল জায়গাটাই আপনি ধরতে পারবেন না। প্রবলেমের রুটে যেতে না পারলে--'বলতে বলতেই তার খেয়াল হল, ওয়াগন-ব্রেকার শঙ্করের ভেতর থেকে অন্য এক শঙ্কর বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ চুপ করে গেল সে।

শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল সুজাতা। ক্রমশ তার চোখ খুলে যাচ্ছে। বস্তিবাসীদের জীবনের ক্ষয় তো আজকের ঘটনা নয়, সেই বৃটিশ কলোনিয়াল অর্থনৈতিক সিস্টেম থেকে ব্যাপারটা ধরতে হবে। নইলে বাইরের স্তরে মাটি আঁচড়ানোই সার হবে। আগের সেই সূক্ষ্ম অহঙ্কার আর নেই। সে ভাবল, বস্তিবাসীদের সম্পর্কে শুরুটা তাকে করতে হবে একেবারেই অন্যভাবে। শঙ্করের দিকে অনেকটা ঝুঁকে আগ্রহের গলায় বলল, 'এ কি, থামলেন কেন?'

বিব্রতভাবে শঙ্কর একটু হাসল, বলল, 'এসব আমার কথা নয়। বন্ধুর কাছে যা শুনেছি তাই স্টমাক থেকে বার করে দিলাম।'

'তাই নাকি? আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হয়।'

'কী?'

'যে বন্ধুর কথা আপনি বলছেন পৃথিবীতে তার কোনো অস্তিত্ব নেই।'

রীতিমত চমকেই উঠল শঙ্কর। বলল, 'না থাকলে এ সব কথা তবে কার?'

সুজাতা সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইকনমিকস অনার্সের ছাত্র শঙ্কর সরকারের।'

শঙ্করের মতো চোয়াড়ে রুক্ষ টাইপের ছেলেও কিছুক্ষণের জন্য বোবা হয়ে রইল। তারপর বলল, 'এর মানে?'

'আজ সীতাকে খুঁজতে আপনার ঘরে গিয়েছিলাম। সেখানেই গ্রেট ডিসকভারিটা হল।'

সুজাতার ভাবনার মধ্যে দ্রত অনেক কিছু ঘটে গেল। কিছুক্ষণ পর সে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। কতদূর পড়াশোনা করেছেন আপনি? অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের কথা কিন্তু বলছি।'

'ফোর্থ ইয়ার কমপ্লিট করেছিলাম। ফাইনালটা দেওয়া হয়নি।'

সুজাতা ভাবছিল, এই ছেলেটাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে পারলে তার অনেক কাজ হবে। প্রথমত, খুব বেশি হলে দু-তিন মাসের বেশি এখানে থাকা তার পক্ষে সম্ভব না। অথচ যে সমস্যায় সে হাত দিয়েছে তা এত অল্প সময়ের মধ্যে ধরা অসম্ভব। শঙ্কর ইউনিভার্সিটির শেষ ডিগ্রিটা না পেলেও এদেশের সোসিও-ইকনমিক প্যাটার্ণ সম্পর্কে তার ধারণা পরিষ্কার। তা ছাড়া এই পরিবেশে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়ে দিয়েছে। এই সব অভিজ্ঞতা সুজাতার রিসার্চের পক্ষে খুবই দামি। যদিও সে ভারতীয় মা-বাবার সন্তান তবু দীর্ঘকাল এদেশের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। সামান্য 'ইমোশন্যাল বণ্ড' টুকু যা অবশিষ্ট আছে। অতি দ্রুত এ দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্তরে যে সব পরিবর্তন ঘটে গেছে বা যাচ্ছে তার মতো একজন প্রায় ফরেনারের পক্ষে তা বুঝে ওঠা সম্ভব না। যা সে বুঝবে তার মধ্যে প্রচুর ফাঁক থেকে যাবে। আমেরিকায় বসে কলকাতার বস্তিবাসীদের নিয়ে রিসার্চ করতে হলে শঙ্করের মতো কাউকে পেলে তার কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। চেষ্টা টেষ্টা করলে সেখানে তার একটা চাকরি জুটিয়ে দেওয়া খুব একটা কষ্টকর হবে না।

সুজাতা দ্বিধান্বিত ভাবে এবার বলল, 'ক্ষমা করবেন, একটা খারাপ প্রশ্ন এবার করব। আপনার নামে কোর্টে কোনো কেস টেস আছে কি? আপনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন—ওয়াগন ব্রেকার, অ্যান্টিসোশাল। তাই এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে সাহস করলাম।' সুজাতা জানে, আদালত থেকে কেউ ক্রিমিন্যাল প্রমাণিত হলে তার পক্ষে বিদেশের পাসপোর্ট পাওয়া অসম্ভব।

শঙ্কর বলল, 'কম করে দু ডজন কেস হয়েছে আমার নামে।

কোনোটাতেই ফাঁসাতে পারেনি, ক্লিন বেরিয়ে এসেছি।'

'ভেরি গুড। তা হলে আপনার জন্যে একটা পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে ফেলি।'

'কিসের পাসপোর্ট?'

'আমেরিকার।'

রীতিমত অবাকই হয়ে যায় শঙ্কর, 'আমাকে আমেরিকায় পাঠাতে চাইছেন নাকি?'

সুজাতা বলল, 'আপনি যদি রাজি হন।'

তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকে শঙ্কর।

সুজাতা আবার বলে, 'আপনার মতো শিক্ষিত ইয়াং ম্যানের পক্ষে এভাবে জীবনটাকে নষ্ট করে দেবার মানে হয় না।'

শঙ্কর এবার বলল, 'আমার চেয়েও অনেক বেশি শিক্ষিত ইয়াং ম্যান এদেশে জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে। তাদের সবাইকে আমেরিকা নিয়ে যেতে পারবেন?'

'সবাইকে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব? একজনকেও যদি সাহায্য করতে পারি—'

সুজাতার কথা শেষ হবার আগেই শঙ্কর বলে উঠল, 'একটা বিরাট সোসাল রেসপনসিবিলিটি পালন করা হয়, না কি বলেন? আমার সম্বন্ধে যে সিমপ্যাথি দেখালেন সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু—'

'কী?'

'আমার সঙ্গে সীতা আর মাকেও নিয়ে যেতে পারবেন তো?'

সীতাদের কথা ভেবে দেখে নি সুজাতা। জানালো আপাতত সেটা সম্ভব না। তবে পরে ওদের নিয়ে যাবার ব্যাপারে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে দেখবে। যতদিন না কোনো একটা ব্যবস্থা হচ্ছে সীতারা এখানেই থাক। শঙ্কর আমেরিকা থেকে তাদের জন্য টাকা পাঠিয়ে দিতে পারবে।

শঙ্কর বলল, 'ওদের ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারব না ম্যাডাম।'

'কেন?'

'আপনি বস্তির অ্যাটমসফিয়ার ভাল করে জানেন না ম্যাডাম। আমি চলে গেলে ওদের, বিশেষ করে সীতার দারুণ ক্ষতি হবে। হারামীর

বাচ্চারা ওকে ছিঁড়ে খাবে।'

বাইশ নম্বর বস্তির মস্তান ফন্টার কথা আগেই শুনেছে সুজাতা। তার সম্বন্ধেই হয়তো ইঙ্গিতটা দিল শঙ্কর।

শঙ্কর বলতে লাগল, আমার মতো অ্যান্টিসোশালদের কথা কেউ ভাবে না। আপনি যে ভেবেছেন সে জন্যে আমি গ্রেটফুল।'

সুজাতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় হঠাৎ কী ভেবে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে শঙ্কর বলে উঠল, 'ঐ দেখুন আপনার সেই মক্কেল এসে গেছে।—আসুন স্যার, আমি এবার উঠব। আপনি এই চেয়ারটায় গেঁড়ে বসুন।' বলতে বলতে উঠে পড়ল সে।

সুজাতার দুই চোখ দরজার দিকে ঘুরে গিয়েছিল। ওখানে অনিমেষ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ গম্ভীর, থমথমে।

শঙ্কর আর দাঁড়াল না, অনিমেষের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুজাতা অনিমেষকে বলল, 'কী হল, ভেতর এস।'

ঘরে ঢুকে চেয়ারটায় গুম হয়ে বসে থাকল অনিমেষ।

চোখের কোণ দিয়ে তাকে লক্ষ করতে করতে সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? খুব ডিসটার্বড মনে হচ্ছে তোমাকে।'

তক্ষুণি উত্তর দিল না অনিমেষ। কিছুক্ষণ পর চাপা তীব্র গলায় বলল, 'তোমার টেস্ট দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।'

হঠাৎ মাথায় প্রবল রক্তচাপ অনুভব করল সুজাতা। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, 'হোয়াট ডু যু মিন? নিজের লিমিট ছাড়িয়ে যেও না। আমার ব্যাড টেস্ট কোথায় দেখলে?

'বস্তির একটা অ্যান্টিসোশাল মস্তানের জন্যে তোমার দরদ উথলে উঠেছে। তাকে আমেরিকা পাঠাতে চাইছ? এটা কী ধরনের টেস্ট?'

বোঝা যাচ্ছে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে তার আর শঙ্করের সব কথাই শুনেছে অনিমেষ। কতক্ষণ আগে সে এসেছিল সুজাতা লক্ষ করে নি। তার মুখ শক্ত হয়ে উঠল। রূঢ় গলায় বলল, 'আমার টেস্টের জন্যে কৈফিয়ৎ চাইবার রাইট তোমাকে কে দিয়েছে?'

মুহূর্তে মিইয়ে গেল অনিমেষ। বলল, 'না না, আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাই নি। প্লিজ ডোন্ট মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড মি।'

সুজাতা একই সুরে বলে যেতে লাগল, 'যাকে তুমি অ্যান্টিসোশাল মস্তান বলছ তার মধ্যে কী এলিমেণ্ট আছে সে সম্বন্ধে তোমার কোনো আইডিয়া নেই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। শঙ্করের জন্যে তোমার যদি সিমপ্যাথি হয়ে থাকে, আই ডোন্ট মাইণ্ড। ইয়াং ম্যান, কোনো স্কোপ না পেয়ে হয়তো মস্তান টস্তান হয়ে গেছে। তার জন্যে যদি সহানুভূতি হয়ে থাকে, সে তো ভালো কথা, কিন্তু—'

উত্তর না দিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল সুজাতা।

অনিমেষ বলতে লাগল, 'শঙ্করকে তুমি নিজের থেকে আমেরিকায় পাঠাতে চাইছ। আর তোমাকে সেই কবে থেকে রিকোয়েস্ট করছি, এয়ার লেটরের এনভেলপ এনে দিয়েছি, অথচ আমার জন্যে আমেরিকায় এখনও একটা চিঠি লিখতে পারলে না। আমার খুব দুঃখ হয়েছে সুজাতা।'

অনিমেষের হিংসেয় পোড়া মুখের দিকে তাকিয়ে পলকে তার আসল চরিত্রটা চোখের সামনে সিনেমার স্লাইডের মতো ভেসে উঠল সুজাতার। তাকে একটা নোংরা পোকার মতো মনে হতে লাগল। সে যে এত ছোট মাপের, বাজে ধরনের মানুষ আগে ভাবা যায় নি। সুজাতা বলল, 'একটা কথা বলছি, যা খুশি মনে করতে পার। আমি শঙ্করকে আমেরিকায় যাবার কথা বলতে সে রিফিউজ করেছে। আর তুমি আমাকে রোজ অস্থির করে ছাড়ছ। ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছ?'

হকচকিয়ে গেল অনিমেষ, 'না মানে—মানে—'

'মানে মানে করতে হবে না। তোমার জন্যে আজই আমি চিঠি লিখে দেব।' সুজাতার চোখেমুখে প্রবল বিতৃষ্ণা ফুটে উঠতে লাগল।

॥ চোদ্দ ॥

আরো কয়েকটা দিন কেটে গেছে।

এর ভেতর আরো পঞ্চাশ ষাটটা ফ্যামিলির ইন্টারভিউ শেষ করে ফেলেছে সুজাতা। ফোটোও তুলেছে অজস্র। তবে মুভি ক্যামেরার ব্যবস্থা এখনও হয় নি। অনিমেষ জানিয়ে গেছে, শিগগিরই ক্যামেরাটা নিয়ে আসবে। তখন নতুন করে আবার ছবি তুলতে হবে।

এই ক'দিনে শঙ্করের সঙ্গে খুব বেশি দেখা হয় নি। শঙ্কর তার রুটিন অনুযায়ী যখন তখন বেরিয়ে যায়, কখন ফেরে তার ঠিক নেই। কাজেই তাকে ধরা খুবই মুশকিল।

তবে যেটুকু দেখা টেখা হয়েছে তাতে শঙ্কর সম্পর্কে আরো অনেক খবর সুজাতার জানা হয়ে গেছে।

বেলেঘাটার এই স্লামে ভাসতে ভাসতে নানা জায়গা থেকে এসে অনেকেই ঠেকেছে। কিন্তু শঙ্করের ব্যাপারটা আলাদা। সে এই বস্তিতেই জন্মেছে। তার বাবা ছিল লেদ মেশিনের মিস্তিরি। মা, বাবা এবং সে—এই নিয়ে তাদের ছোট মাপের সংসার। মা ছিল হাঁপানির রুগী, শ্বাসকষ্টে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সারাদিনই বিছানায় পড়ে পড়ে সে কাতরাতো। বাপ ছিল প্রচণ্ড মাতাল। যা রোজগার টোজগার করত তার বেশির ভাগটাই চোলাইয়ের দোকানে রেখে আসত। এমন মা-বাপেব ছেলে যেমন হয়, শঙ্কর তাদের থেকে আলাদা কিছু ছিল না। রাস্তায় রাস্তায় অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলে টেলে কি এদিকে সেদিকে ছোটখাটো চুরিচামারি করে বেড়াত। লুকিয়ে চুরিয়ে সিগারেট ফুঁকত, মুখে তখন তার সর্বক্ষণ অকথ্য খিস্তি।

শঙ্করের বয়স যখন সাত সেই সময় একবার জেনারেল ইলেকশান হল। এই এলাকার এক পলিটিক্যাল নেতা ভোট চাইতে বস্তিতে এলেন। আর তখনই শঙ্কর তার নজরে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় দারুণ ফুটফুটে চেহারা ছিল তার, মনেই হত না বস্তির মাতাল বাপের ছেলে।

নেতাটি উদ্যোগী হয়ে তাকে কর্পোরেশনের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করে দেন, বইটইও কিনে দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম স্কুলে যেতে চাইত না শঙ্কর, রাস্তায় রাস্তায় চরে বেড়ানো যার অভ্যাস তাকে স্কুলের খাঁচায় পুরে রাখা সোজা ব্যাপার না। কিছুদিন পরে কিন্তু পড়াশোনায় মন বসে গেল শঙ্করের। টকাটক প্রোমোশন পেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠতে লাগল।

মা-বাপেরও তার পড়ার ব্যাপারে ইন্টারেস্ট হল। তাদের আশা ছেলেটা পাশটাশ করে চাকরি জোটাতে পারলে দুঃখ টুঃখ ঘুচবে। বাপ চোলাইয়ের খরচ কমিয়ে ছেলের পেছনে পয়সা ঢালতে লাগল।

রাজনৈতিক নেতাটির কোনো গভীর উদ্দেশ্য ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু তিনিও হাজারটা কাজের মধ্যে শঙ্করের খোঁজখবর নিতেন। নতুন ক্লাসে উঠলে বইটই তো কিনে দিতেনই, মাঝে মধ্যে দু-দশটা টাকা বা জামা প্যান্টও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেত।

কিন্তু মায়ের কাছে ছেলেকে ঘিরে ভবিষ্যতের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। শঙ্কর যখন ক্লাস নাইনে পড়ছে সেই সময় দুম করে মা মারা গেল। তারও কয়েক বছর বাদে লিভার ফেটে বাপ মরল। তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে শঙ্কর।

এদিকে যে রাজনৈতিক নেতার নজরে সে পড়েছিল, তখন একটা ইলেকশানে মারাত্মকভাবে হেরে তাঁর হাল বেজায় খারাপ। ওই এলাকায় তাঁর পার্টির ভিতও নড়ে গিয়েছিল। শঙ্করের দিকে তখন আর লক্ষ্য নেই। অথচ শঙ্কর ভেবে রেখেছিল অনার্সটা পেয়ে গেলে সে নেতাকে ধরে একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে নেবে। কিন্তু যার নিজেরই পায়ের তলায় মাটি নেই সে অন্যকে কী সাহায্য করবে?

বাবা পয়সাকড়ি কিছুই রেখে যায়নি। একটা পেট হলেও তো চালাতে হবে। তা ছাড়া বস্তির ঘর ভাড়া আছে। শঙ্কর এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে চাকরির খোঁজে ডালহৌসি স্ট্রিটের অফিস পাড়ার দরজায় দরজায় দশটা থেকে পাঁচটা হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল। তখন পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছে সে। দুপুরে একসঙ্গে চাকরি খোঁজা আর কলেজে ক্লাস করা একেবারেই সম্ভব হচ্ছিল না। সে ভেবেছিল একটা বছর ড্রপ দিয়ে পরের বছর আবার ক্লাস শুরু করবে, তার ভেতর নিশ্চয়ই একটা ক্লার্ক ফ্লার্কের

কাজ কি আর জুটবে না?

এক বছরের জায়গায় তিন চার বছর কেটে গেল। তার ভেতর দশ বারোটা ইন্টারভিউ আসত আর তার আশা হতো, এবার কিছু একটা হয়ে যাবে। কিন্তু ইন্টারভিউ পাওয়া এবং চাকরি পাওয়া এক ব্যাপার না। ততদিনে শঙ্কর জেনে গেছে নিউজপেপারে চাকরির বিজ্ঞাপন বা ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ একেবারেই বাইরের শো, ভেতরে ভেতরে লোক ঠিক করাই থাকে। একটি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মামা, জামাইবাবু বা পলিটিক্যাল লিডার ছাড়া চাকরি পাওয়া স্রেফ অসম্ভব। মাত্র তিন চারটে টিউশানির ওপর ভরসা করে সে তখন কোনো রকমে টিকে আছে। তা-ও এটা ফিক্সড বা পার্মানেন্ট ব্যাপার না। বছরের শেষে স্কুলে অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেলেই টিউশানিগুলো চলে যেত। নতুন ক্লাস শুরু না হওয়া পর্যন্ত সে পুরোপুরি বেকার।

বছর তিনেক ডালহৌসিতে ঘোরাঘুরির পব শঙ্কর বুঝতে পারল, একশ বছর ঘুরলেও এখানে তার আশা নেই। এই সিস্টেমে তার মতো পেডিগ্রিহীন, লেদ মেশিনের মৃত মজুরের ছেলের পক্ষে কিছুই করা বা পাওয়া অসম্ভব। ফ্রাস্ট্রেশনের শেষ মাথায় পৌঁছে ঝলমলে আলোকিত জীবনের উল্টোদিকে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গে পা বাড়াল। ক্রমে সে হয়ে উঠল এ অঞ্চলের দুধর্ষ মস্তান, কুখ্যাত ওয়াগন ব্রেকার। দাগী সমাজবিরোধী হিসেবে তার নাম পুলিশের পাকা খাতায় উঠে গেল।

শঙ্করের কথা শুনতে শুনতে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে সুজাতার।

এ ক'দিনে শঙ্করের জীবনের ব্যাকগ্রাউণ্ড ছাড়াও আবেকটা কথা তার কানে এসেছে। বাইশ নম্বর বস্তির ফন্টার গ্যাংয়ের সঙ্গে শঙ্করের গ্যাংয়ের নাকি এর মধ্যে তিন চার বার প্রচণ্ড মারপিট এবং বোমাবাজি হয়ে গেছে। সীতার ব্যাপারে আগে থেকেই শঙ্করের ওপর তার আক্রোশ ছিল। ফন্টা নাকি বলে বেড়াচ্ছে, বদলা এবার সে নেবেই। সীতাকে নাকি এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। মায়ের দুধ খেয়ে থাকলে শঙ্কর যেন তাকে রোখে। এই এলাকায় হয় সে থাকবে. নয় শঙ্কর। এক বনে দুই শেবের জায়গা নেই।

এই বস্তিতে পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যতগুলো ফ্যামিলি পাওয়া গেছে, সবার ইন্টারভিউ করে ফেলেছে সুজাতা। আজ থেকে উত্তর-দক্ষিণের ফ্যামিলিগুলোকে সে ধরবে।

সকালে চা-টা খেয়ে অন্য দিনের মতো আজও সীতাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সুজাতা। উত্তর দিকের শেষ মাথায় প্রথম ঘরটার কাছে এসে ডাকাডাকি করতেই ভেতর থেকে একটা চোয়াড়ে ধরনের ছোকরা বেরিয়ে এল। তার পেছন পেছন রুক্ষ চেহারার মধ্যবয়সী একটা মেয়েমানুষ। খুব সম্ভব ছোকরার মা।

ছোকরার ভাঙা গালের মাঝামাঝি পর্যন্ত জুলপি, লালচে চোখ, লম্বা বোতলের মতো মুখ। পরনে সবুজ লুঙ্গির ওপর হাতায়-গলায় কাজ-করা মেরুন রঙের পাঞ্জাবি। বাঁ হাতের কব্জিতে স্টিলের ঢলঢলে একটা বালা।

ছোকরাটার নাম নেলো। আগেও দু-চারবার তাকে দেখেছে সুজাতা। মুখ চেনা, নামটাও শুনেছে।

নেলো বলল, 'ও, আপনি! কিন্তু এখানে সুবিধা হবে না দিদিমণি—'

সুজাতা হকচকিয়ে গেল। বলল, 'বেশিক্ষণ সময় নেব না আপনার। দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাব।'

'আপনার একটা কথারও জবাব দেব না।'

'সবাই তো দিচ্ছে, আপনার আপত্তি কেন ভাই?'

'সে কৈফিয়ৎ আপনাকে দেব না। দয়া করে হড়কে যান।'

সুজাতার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করল সীতা, 'চলুন দিদি, চলুন। অন্য ঘরে যাই।'

সুজাতার জেদ চেপে গেল। শেষ অস্ত্র হিসেবে শঙ্করের নাম করে সে বলল, 'ওঁর কাছ থেকেই আমি আসছি। আপনি হয়তো শুনেছেন, এখানকার সবাইকে ডেকে উনি আমাকে সাহায্য করতে বলেছেন।'

নেলো খেপে উঠল, 'শঙ্কর কি আমার ফাদার যে সে বললেই আমাকে সব কিছু করতে হবে। পুলিশের মালকে আমি কিছু বলব না।'

সুজাতা বুঝতে পারল, এ বস্তির সবাই শঙ্করের কথায় ওঠে-বসে না, দু-চারটে ব্যতিক্রমও আছে। অবাক হয়ে সে বলল, 'পুলিশের মাল কি?'

উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল নেলো।

নেলোর চেঁচামেচিতে লোক জমে গিয়েছিল। সীতা চাপা গলায় জানালো, পুলিশের মাল মানে পুলিশের গুপ্তচর। তারপর তার হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

কিন্তু নেলোর কথায় কিছু প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকবে। শুধু পাশের ঘরের লোকেরাই না, পর পর চারটে ফ্যামিলির কারো মুখ থেকেই একটা কথাও বার করতে পারল না সুজাতা। তারপর দু-তিনটে ঘরের লোকজন তার প্রশ্নের যা জবাব দিল তাতে যথেষ্ট মেটিরিয়াল নেই।

সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন কেমন হয়ে গেছে। কিছুই আর ভাল লাগছে না সুজাতার। সে সীতাকে বলল, 'চল, ফেরা যাক। কাল আবার দেখা যাবে।'

সীতাও তাই চাইছিল। বলল, 'তাই চলুন দিদি। সকালবেলায় নেলোটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করল।'

অলিগলি দিয়ে ফিরতে ফিরতে সুজাতা ক্ষুব্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটা আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল কেন বল তো?'

'কি জানি।'

একটু ভেবে সুজাতা বলল, 'নেলো কী করে?'

'কী আবার করবে! রাত্রিবেলা ছোরা কি পাইপগান নিয়ে নিরালা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। কাউকে পেলে ছোরা টোরা বসিয়ে ধরে ছেনতাই করে।'

'ওই জন্যেই বোধ হয় ইন্টারভিউ দিতে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু আমাকে পুলিশের লোক ভাবল কী করে?'

'বুঝতে পারছি না।'

ঘর পর্যন্ত এসে সীতা কিন্তু ভেতরে ঢুকল না। সোজা ডান দিকে চলে গেল। সুজাতার মনটা এত খারাপ হয়ে গেছে যে ঘরে এসে ক্যামেরা ট্যামেরাগুলো টেবলে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ছোকরা এভাবে তাকে অসম্মান করবে, ভাবা যায় নি। হঠাৎ ভয়ানক অবসন্ন বোধ করতে লাগল সে।

পাঁচ মিনিটও কাটল না, হঠাৎ শঙ্করের উত্তেজিত গলার স্বর ভেসে এল, 'শুয়ারের বাচ্চাকে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ছি—' তারপরেই চটি টেনে টেনে সামনের গলি দিয়ে দৌড়ে যাবার আওয়াজ শোনা গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে এসে ঢুকল সীতা। সুজাতা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে সীতা, শঙ্করবাবু অমন উত্তেজিত হয়ে কোথায় দৌড়ে গেলেন?'

'নেলোর কথা দাদাকে বলেছি। শুনে ভীষণ রেগে গেছে। আজ নেলোর কপালে দুঃখ আছে।'

চমকে উঠে বসল সুজাতা। উদ্বিগ্ন মুখে বলল, 'এ সব কথা ওঁকে আবার বলতে গেলে কেন? শুধু শুধু একটা গোলমাল হবে।'

'হোক গোলমাল। যেভাবে আপনাকে নেলোটা অপমান করল, ওকে ওষুধ দেওয়া দরকার।'

গভীর উৎকণ্ঠায় সুজাতা বলল, 'না না, নেলোর কথা বলা তোমার ঠিক হয় নি। আমার জন্যে এখানে কোনো অশান্তি হয়, এ আমি চাই না।' অত্যন্ত বিপন্ন দেখাল তাকে।

সীতা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আবার শঙ্করের গলা শোনা গেল, 'আয় হারামীর বাচ্চা, ক্ষমা চাইবি আয়—' মনে হল কাউকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে সে।

একটু পর দরজার ওধার থেকে শঙ্কর বলে উঠল, 'ম্যাডাম, একটু বাইরে আসুন তো।'

দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুজাতা। সঙ্গে সঙ্গে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গেল যেন। নেলোর চুলের গোছা শঙ্করের এক হাতে ধরা, তার আরেক হাতে একটা দশ ইঞ্চি ড্যাগার।

নেলোর মুখটুখ ফেটে রক্ত ঝরছে। ডান চোয়াল এবং বাঁ ভুরুর ওপরটা মার্বেল গুলির মতো ফুলে আছে, সেই মেরুন রঙের কাজ-করা পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে।

ওদের পেছনে সেই মাঝবয়সী রুক্ষ ক্ষয়াটে চেহারার মেয়েমানুষটা—নেলোর মা—গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে কাঁদছে, 'ছেড়ে দে শঙ্কর, নেলো আর করবে না। ছেড়ে দে, তোর পায়ে পড়ি বাবা—' ওদের ঘিরে বিরাট ভিড়। গোটা বস্তিটা ভেঙে পড়েছে চারপাশে।

শঙ্করের চোখদুটো টকটকে লাল। মনে হয় শরীরের সব রক্ত সেখানে উঠে এসেছে। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত, চুল উষ্কখুষ্ক। তারও জামার পকেট টকেট ছিঁড়ে গেছে। কপাল এবং গাল ছড়ে চামড়া উঠে গেছে।

বোঝা যায়, নেলো সহজে আসতে চায় নি। তাকে টানা হ্যাঁচড়া করার সময় এগুলো হয়েছে। এই মুহূর্তে শঙ্করের চেহারাটা হিংস্র, জান্তব, ভীতিকর। এই শঙ্করকে আগে আর দেখে নি সুজাতা।

শঙ্কর ছোরাসুদ্ধ হাতটা সুজাতার দিকে বাড়িয়ে চাপা কর্কশ গলায় বলল, 'তুই এঁকে পুলিশের মাল বলেছিস? উনি খোঁচড়?'

বেদম মার খেয়েও নেলো দমে নি। সে প্রায় রুখেই উঠল, 'হ্যাঁ, বলেছি। খোঁচড়কে খোঁচড় বলব, না সগ্‌গের মা দুগ্‌গা বলব! আমাদের খবর বার করবার জন্যে পুলিশ এই মেয়েটাকে ফিট করে দিয়েছে।'

'চোপ কুত্তার বাচ্চা—তোমার পাছার হাড্ডি ঢিলে করে দিচ্ছি—দাঁড়াও।' বলেই ফুটবলে হাই কিক মারার মতো টেনে লাথি হাঁকায় শঙ্কর।

সঙ্গে সঙ্গে নেলোর মায়ের কান্নাটা আচমকা তিন পর্দা চড়ে যায়।

এদিকে শরীরটা বেঁকে দুমড়ে গেছে নেলোর। দাঁতে দাঁত চেপে দম বন্ধ করে যন্ত্রণাটা সামলে নেয় সে। তারপর বলে, 'আমার লাশ ফেলে দিলেও যা সত্যি তা বলবই। আমরা শালারা কেউ তো ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির না। সবার পেছনে গত্ত। আমাদের ছবি খিঁচে, গলা টেপ করে এই মেয়েছেলে সে সব মাল পুলিশের হাতে তুলে দেবে। তারপর পুলিশ আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে এমন ঝাড় দেবে যে হোল লাইফ আর বাপের নাম মনে করতে পারব না।'

'মাকড়া, আমার গেস্টকে ইনসাল্ট করছ! এঁর কাছে ক্ষমা চা খানকির ছেলে—'

অকথ্য একটা খিস্তি দিয়ে নেলোকে এক ঝটকায় সুজাতার পায়ের ওপর ছুঁড়ে দিল শঙ্কর, 'পায়ে মাথা রেখে ক্ষমা চা—'

সুজাতা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এমন দৃশ্য বা ঘটনা আগে আর কখনও দেখে নি সে। তা ছাড়া তাকে নিয়েই যে এ জাতীয় একটা ব্যাপার ঘটবে, বস্তিতে ঢোকার আগে ভাবতেও পারে নি। সারা শরীর অদ্ভুত এক টেনশনে কাঁপছে। আবছা নার্ভাস গলায় বলল, 'ওকে ছেড়ে দিন শঙ্করবাবু। প্লিজ—'

'যা বলেছি তা না করলে ওকে ছাড়া হবে না।' শঙ্কর বলল।

'আমি ক্ষমা চাইব না।' নেলো পায়ের কাছ থেকে মুখ তুলে একরোখা

ভঙ্গিতে বলল।

হাতের ছোরাটা নাচাতে নাচাতে চোখ কুঁচকে শঙ্কর বলল, 'এটা দেখেছিস! পেটের ভেতর স্ট্রেট পুরে দেব—'

নেলো হিংস্র চোখে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে কিছু বলল না। তারপর আচমকা কেউ কিছু বুঝবার আগেই ঝট করে স্প্রিংয়ের মতো একটা মোচড়ে শরীরটাকে টেনে তুলে ভিড়ের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড় লাগাল। দূর থেকে তার গলা ভেসে আসতে লাগল, 'পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঘরে খোঁচড় এনে রেখেছে। আমাদের গারদে ঢোকাবার ধান্দা! আমিও শালা নেলো, আমার গায়ে হাত তুলেছে। বদলা যদি না তুলতে পারি তো আমি বেজন্মা—বাপের ঠিক নেই আমার।'

প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল শঙ্কর। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলে সে বুঝতে পারত, নেলোর সন্দেহটা একেবারে অকারণ না। পুলিশ অফিসার পরিতোষ চ্যাটার্জি যে সুজাতাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে, সেটা বস্তির সবারই চোখে পড়েছে। তা ছাড়া মাঝে মাঝে সে তার খোঁজ নিয়ে যায়। থানার ও.সি. সরকার এবং প্লেন ড্রেসের পুলিশও এখানে আসছে। কী উদ্দেশ্যে তারা প্রায় নিয়মিত যাতায়াত করছে, অতটা তলিয়ে ভাবার কথা নয় নেলোর মতো ছোকরাদের। পুলিশের গন্ধ পেয়েই সে ভয় পেয়ে গেছে। তার সন্দেহ পুলিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শঙ্কর বস্তির অ্যান্টি-সোশালদের ফাঁসাতে চায়। সেই কাজে সুজাতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ও সব বই টই লেখার ব্যাপার স্রেফ ধোঁকা। একটা কিছু বলে তো ছবি তুলতে বা গলার স্বর টেপে ধরতে হবে।

নেলোর ধারণা, সব অ্যান্টিসোশালকে ধরিয়ে দেবার পুরস্কার হিসেবে শঙ্গর বেঁচে যাবে, তার গায়ে এতটুকু আঁচড়ও লাগবে না।

শঙ্করের গ্যাংয়ের কয়েকটা ছোকরাও ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল। শঙ্কর চিৎকার করে বলল, 'অ্যাই অ্যাই মানকে—খানকির ছেলেটাকে ধর তো। আজ ওর যদি লাশ না ফেলি তো আমার নাম শঙ্কর না।' বলতে বলতে ছোরা উঁচিয়ে ছুটল শঙ্কর। তার পেছনে মানকে, গ্যাঁটা, গণশা—এমনি আরো কয়েকটা ছোকরা।

চারপাশের চাপ-বাঁধা ভিড়টা সন্ত্রস্ত ভাবে সরে সরে তাদের রাস্তা করে

দিল। নেলোর মা-ও চেঁচাতে চেঁচাতে তাদের পেছনে ছুটল।

কিন্তু দৌড়ে গিয়েও নেলোকে ধরা গেল না। এই বস্তি থেকে সে উধাও হয়ে গেছে।

বিকেলের দিকে খবর পাওয়া গেল, নেলো বাইশ নম্বরে গিয়ে উঠেছে। তার মা-ও সেখানে চলে গেছে। শঙ্করকে খেপিয়ে দিয়ে এ বস্তিতে থাকা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।

শোনা গেল, ফন্টা নেলোকে শেলটার দিয়েছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে, যেভাবেই হোক বদলা নেবেই। দু'জনের বদলা দু'রকমের। নেলো তার মারের শোধ তুলবে। আর যার জন্য শঙ্করের সঙ্গে ফন্টার পুরনো শত্রুতা সেই সীতাকে এ বস্তি থেকে স্রেফ তুলে নিয়ে যাবে।

॥ পনেরো ॥

ব্যাপারটা হঠাৎ যেদিকে মোড় নিয়েছে তাতে ভীষণ ভয়পেয়ে গেছে সুজাতা। আমেরিকাতেও প্রচুর গ্যাংস্টার আছে, মাঝে মাঝেই গান ফাইট টাইট হয় কিন্তু তাদের খবর দূর থেকেই শুনেছে বা খবরের কাগজের পাতায় পড়েছে সে। নিজের দেশে এসে এরকম একটা মারাত্মক ঘটনায় জড়িয়ে পড়বে, কে ভাবতে পেরেছিল!

একবার সুজাতা ভাবল, এখান থেকে চলে যাবে। শঙ্করকে সে কথা বলতেই সে হাসল। বলল, 'নার্ভাস লাগছে?'

মুখ নিচু করে রইল সুজাতা।

শঙ্কর এবার বলল, 'ঠিক আছে, চলে যেতে চাইলে কী আর করা যাবে। কিন্তু—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে এবার তাকাল সুজাতা।

শঙ্কর বলল, 'তা হলে ক্যালকাটার স্লামের সব দিক আপনার আর দেখা হল না। কয়েক হাজার মাইল পেরিয়ে আমেরিকা থেকে যে জন্যে এসেছেন সেই পারপাসটাই কিন্তু বরবাদ হয়ে যাবে।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

শঙ্কর বুঝিয়ে দিতে লাগল। কলকাতার বস্তিতে নোংরা-আবর্জনা, গু-মুত, পভার্টি লাইনের নিচের মানুষের জঘন্য জীবন যাপন যেমন সত্যি তেমনি সত্যি প্রতি মুহূর্তে এখানকার ভায়োলেন্স, মারদাঙ্গা, মার্ডার। যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ খুন হয়ে যেতে পারে। এই ভায়োলেন্সের দিকটা না দেখলে কলকাতার বস্তি জীবনকে ঠিকমতো ধরা যাবে না। এখন সুজাতা চলে যাবে, না এখানে থাকবে সেটা তার ইচ্ছা।

কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিতের মতো বসে রইল সুজাতা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি থেকেই যাই।'

শঙ্কর বলল, 'আপনার ভয় নেই। আমি তো আছি, কোনো শালা এ. বস্তিতে এলে স্রেফ ডেডবডি যাবে। ডোন্ট ওরি।'

নেলোকে নিয়ে সেই বিশ্রী ঘটনাটার পর দু' দিন কেটে গেছে।

এর মধ্যে সীতাকে নিয়ে সুজাতা সকাল-বিকেল বস্তিতে বেরিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আগের সেই উৎসাহ যেন আর নেই। দু-একটা ফ্যামিলির সঙ্গে কথাবার্তা বলেই সে ফিরে এসেছে।

এখন সন্ধ্যা।

পাঁচ শ উনুনে রোজকার মতো আজও আঁচ পড়েছে। ধোঁয়া এবং কার্তিকের কুয়াশা মিশে যে 'স্মগ' তা বেলেঘাটার এই বস্তির দম বন্ধ করে দিচ্ছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর অন্য দিনের মতো আজও সীতাকে নিয়ে বেরিয়েছিল সুজাতা, কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে। তার একটু পরেই এসেছিল অনিমেষ। আজ একটা মুভি ক্যামেরা নিয়ে এসেছে সে।

এখন ঘরে সুজাতা এবং অনিমেষ ছাড়া আর কেউ নেই। অনিমেষ এলে সীতা এ ঘরে থাকে না, পাশের ঘরে মলিনার কাছে চলে যায়।

সুজাতার ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে রাখা হয়েছে। ওটা খোলা থাকলে গল গল করে গাঢ় ধোঁয়া ঢুকে পড়বে। যতক্ষণ না ধোঁয়া কাটে ওটা বন্ধই রাখে সুজাতা।

তবু ফাঁক টাক দিয়ে যে ধোঁয়া ঢুকছে তা পেছনের জানালা দিয়ে বার করে দেবার জন্য ফুল স্পিডে ফ্যান চালানো রয়েছে। যদিও এই কার্তিক মাসে কলকাতায় যেটুকু ঠাণ্ডা পড়েছে তাতে সন্ধেবেলায় ফ্যানের হাওয়ার দরকার নেই। মাথার ওপর এক শ পাওয়ারের বাল্বটাও জ্বলছে। তারও উত্তাপ কিছু রয়েছে।

সুজাতা খুবই উৎসুকভাবে মুভি ক্যামেরাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। সেই সঙ্গে এলোমেলো কথা বলছিল অনিমেষের সঙ্গে।

ক'দিন আগে সুজাতাকে দিয়ে অনিমেষ আমেরিকার ব্যাপারে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়েছে। তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল।

অনিমেষ বলল, 'তুমি এত বিজি, এই স্লাম এরিয়াতে এত বিরাট কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছ—তবু তোমার ওপর রেগুলার প্রেসার দিয়ে চিঠি লেখালাম। আসলে ব্যাপারটা কি জানো?'

অনিমেষের কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেয় না সুজাতা। মুভি ক্যামেরাটা

দেখতে দেখতে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, 'কী?'

'আমেরিকায় যে যেতে চাইছি তার একটাই কারণ।'

'কী কারণ?'

'তোমার কাছাকাছি থাকা।'

অনিমেষের মধ্যে সূক্ষ্ম রিফাইনড কোনো ব্যাপার নেই, প্রায় সবটাই মোটা দাগের। কাউকে ভাল লাগলে বা পছন্দ হলে কোনো শিক্ষিত কালচার্ড যুবক এভাবে তা বলে না। সুজাতা উত্তর না দিয়ে চুপচাপ থাকে।

অনিমেষ আবার বলে, 'ইন ফ্যাক্ট, তোমাকে না দেখলে ভাল লাগে না। দু'তিন মাস বাদে তুমি আমেরিকায় চলে গেলে আমার কাছে লাইফের আর কোনো চার্ম থাকবে না। তাই আমেরিকায় যাবার জন্যে তোমাকে এত বিরক্ত করছি।'

সুজাতা কৌতুক বোধ করে। হয়তো তাকে ভালই লেগেছে অনিমেষের কিন্তু সেটা আসল নয়। তাকে ধরে আমেরিকায় যাওয়াটাই তার একমাত্র লক্ষ। স্বার্থ, শুধুই স্বার্থ। আর সেই কারণেই অনিমেষের এত ফ্ল্যাটারি, এত মিষ্টি কথা।

ইচ্ছা করলে অনিমেষকে উসকে দেওয়া যায় কিন্তু তাতে সময় এবং এনার্জি নষ্ট। উদাসীন মুখে সুজাতা বলল, 'বিরক্ত হই নি। আমার চিঠিতে তুমি যদি আমেরিকায় যেতে পার, খুশিই হব।'

সুজাতা লক্ষ করেছে, সেদিনের পর শঙ্কর সম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলে নি অনিমেষ। সুজাতাও তার প্রসঙ্গ তোলে নি। এমনকি নেলোকে নিয়ে যে উত্তেজক ব্যাপারটা ঘটে গেছে তা-ও অনিমেষকে জানায় নি।

আগে আগে রোজ কতটা কাজ সে করেছে, কোন কোন ক্লাসের লোকের ইন্টারভিউ নিয়েছে, অনিমেষকে মোটামুটি জানাতো। আদতে অনিমেষ উপলক্ষ মাত্র, তাকে সামনে বসিয়ে দৈনন্দিন কাজের অ্যাডভান্সমেণ্ট নিজেকেই শোনাত সে।

নেলোর ঘটনাটা যে জানায় নি তার কারণ একটাই। জানালে অনিমেষ নির্ঘাত পরিতোষকে দিয়ে বেলেঘাটার স্লাম এরিয়া তোলপাড় করে ফেলত। তাতে তার উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে যেত। তার জন্য এখানে পুলিশ ঢুকলে

কেউ আর মুখ খুলতে চাইবে না। তা ছাড়া তাকে পুলিশের লোক বলে সবাই ধরে নিত। নেলো এর মধ্যে 'খোঁচড়' বলে তার যথেষ্ট অসুবিধা করে গেছে।

অনিমেষ এবার বলল, 'তোমার কাজ কিরকম চলছে? আজ ক'টা ফ্যামিলির ইন্টারভিউ নিলে?'

অনিমেষের এই প্রশ্নগুলো একেবারে ছকে বাঁধা। রোজই মেকানিক্যাল সুরে এগুলো করে থাকে সে।

সুজাতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় একসঙ্গে পর পর দুটো ঘটনা ঘটল। এক নম্বর ঘটনা লোডশেডিং। দু নম্বরটা হল বোমাবাজি। বস্তির খুব কাছাকাছি ক্রমাগত বোমা ফাটর আওয়াজ হচ্ছে।

লোডশেডিং ব্যাপারটায় অনিমেষ অভ্যস্ত। তাদের যোধপুর পার্কে এমনও দিন মাঝে মাঝে যায়, ছ'ঘণ্টার বেশি পাওয়ার থাকেনা। কিন্তু তাদের 'পশ' লোকালিটিতে বোমবাজি টাজি হয় না। বোমার খবর সে শুধু খবরের কাগজেই পায়।

অনিমেষ চমকে উঠল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিসের আওয়াজ সুজাতা?'

বোমার শব্দ প্রতি রাত্রেই শুনতে পায় সুজাতা। এতে খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে। সে ততটা ভয় পেল না। টেবলের ড্রয়ারে মোমবাতি আর দেশলাই মজুত থাকে। লোডশেডিংয়ের সময় দরকার। ড্রয়ার খুলে সে সব বার করে জ্বালিয়ে ফেলল সুজাতা। টেবলের ওপর মোমটা বসিয়ে বলল, 'মস্তানরা পেটো ফাটাচ্ছে।' এর মধ্যে নানা জাতের নানা পেশার লোকদের ইন্টারভিউ নিতে নিতে বস্তি এবং অপরাধ জগতের প্রচুর ইডিয়ম, ফ্রেজ এবং অদ্ভুত অদ্ভুত সব ভাষা জোগাড় করে ফেলেছে। মাঝে মাঝে সেগুলো ব্যবহারও করে সুজাতা।

প্রথমে একটা দুটো করে ফাটছিল। এখন বৃষ্টির মতো বোমা পড়ছে। শব্দটা দ্রুত এদিকেই এগিয়ে আসছে।

ঘরে বসেই টের পাওয়া যাচ্ছে কারা যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে দুদ্দাড় ছুটে পালাচ্ছে। তাদের আবছা সন্ত্রস্ত গলা ভেসে আসছে। ঘরে ঘরে দুমদাম দরজা বন্ধ হচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝবার জন্য দরজা খুলে সুজাতা মুখ বাড়াতেই দেড় দুশ গজ দূরে প্রচণ্ড শব্দ করে সাত আটবার আগুনের ঝলক উঠল। মুহূর্তে মনে হল চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেছে। গোটা এলাকার মাটি চৌচির হয়ে ফেটে গেল বুঝিবা।

বস্তির গলিগুলো একেবারে ফাঁকা। তার ওপর লোডশেডিং হওয়ায় যুদ্ধকালীন ব্ল্যাক-আউটের মতো অবস্থা চলছে যেন। কুয়াশা এবং ধোঁয়া মেশানো ভূতুড়ে অন্ধকারে গোটা স্লাম এরিয়াটা যেন পৃথিবীর শেষ বিপর্যয়ের জন্যে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে।

দৌড়ে ঘরের ভেতর এসে দরজা বন্ধ করে দিল সুজাতা। মারাত্মক ভয় পেয়ে গেছে সে। তার চাইতেও বেশি ভয় পেয়েছে অনিমেষ। সে বলল, 'কী হচ্ছে বল তো?' 'কিছুই বুঝতে পারছি না।' তার গলার স্বর ঝাপসা, কাঁপা কাঁপা।

সুজাতা বলল, 'মস্তানদের ভেতর ফাইট চলছে, মনে হয়।'

বোমার আওয়াজ আরো এগিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে হল্লাও শোনা যাচ্ছে।

কে যেন উত্তেজিত জান্তব গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় গেলি রে খানকির ছেলে শঙ্কর। বাপের ঠিক থাকলে বেরিয়ে আয়—'

'শঙ্করদের ঘর কোনটা?'

'শালাকে না পেলে বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেব।'

'এই যে এই ঘর শঙ্করের। বেরো শালা, ইঁদুরের মতো ঢুকে আছিস কেন? আজ তোর লাশ ফেলে দিয়ে যাব।'

শেষ গলাটা নেলোর। এতক্ষণে বোঝা গেল, সে ফন্টার গ্যাংকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

শঙ্কর সম্বন্ধে সুজাতা যখন ভয়ানক চিন্তাগ্রস্ত সেই সময় দড়াম করে এক লাথিতে তার ঘরের পলকা দরজাটা ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মোমের আলোয় চোখে পড়ল, সাত আটটা ছোকরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সবার হাতে পাইপগান বা ছোরা। তাদের মধ্যে নেলোকেও দেখা যাচ্ছে।

একটা ছোকরা বলল, 'জোড়া মুরগি ঘরে বসে বকম বকম করছে গুরু—'

হিংস্র গলায় আরেকটা ছোকরা জিজ্ঞেস করল, ‘শঙ্কর আর সীতা কোথায়?’ তার হাতে একটা পাইপ গান।

অস্পষ্ট গলায় সুজাতা বলল, ‘জানি না। সকাল থেকে দেখি নি।’

পাইপগানের নলটা সোজা সুজাতার দিকে তাক করে ছোকবা বলল, ‘আমার কাছে ফলস্‌ মেরো না। কোথায় শঙ্কর?’

‘বিশ্বাস করুন, আমি জানি না—’ জীবনে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আর কখনও পড়ে নি সুজাতা। তার হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে যেতে লাগল।

এবার পাইপগানটা অনিমেষের দিকে ঘুরল। ছোকরা বলল ‘অ্যাই মাকড়া, তুমি জানো?’

হাতজোড় করে সারেণ্ডারের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল অনিমেষ। হাঁটুতে তার আর শক্তি নেই। কোনোরকমে নিজেকে খাড়া রেখে গোঙানির মতো আওয়াজ করে সে বলতে লাগল, ‘আমি কিছু জানি না, প্লিজ বিশ্বাস করুন। আমি এখানে থাকিও না—’ সুজাতাকে দেখিয়ে বলল, ‘আমি এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আমাকে মার্ডার করবেন না দয়া করে। লাইফে আর কখনও এদিকে আসব না।’

অনিমেষের কথাগুলো হয়তো বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় ছোকরার। পাইপগান নামিয়ে সে বলে, ‘হ্যাঁ, আর এসো না। এরিয়া বহুত খারাপ।’ বলেই সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে ফিরে বলে, ‘চল, পাশের ঘরটা দেখি—’

শরীর আর মনের সবটুকু শক্তি এবং এনার্জি ফুরিয়ে গিয়েছিল অনিমেষের। টলতে টলতে ফের বসে পড়ে সে। ঘাড় ভেঙে মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে যেন, দু হাতে মুখ ঢাকে অনিমেষ।

ওদিকে চলে যেতে গিয়েও হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় থমকে দাঁড়ায় নেলো। সুজাতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে উত্তেজিত মুখে বলে, ‘ফন্টাদা, তোমাকে আমেরিকান খোঁচড়ের কথা বলেছিলাম না, এই যে সেই মাল। ছবি খিঁচে, গলার আওয়াজ টেপ করে আমাদের ফাঁসাবার ধান্দায় এখানে ঢুকেছে।’

মুহূর্তে ফন্টার মুখটা পাল্টে গিয়ে কোনো মারাত্মক খুনীর মুখ হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে সে হুকুম দেয়, ‘ক্যামেরা ফ্যামেরা ভেঙে দে,

আর শালীকে তুলে নিয়ে চল।'

দু মিনিটের ভেতর যুদ্ধের ফর ফ্রন্টের যা হাল হয়, গোটা ঘরটা তা-ই হয়ে যায়। নিরুপায় বসে থাকতে থাকতে সুজাতা দেখে নিজের ক্যামেরা আর অনিমেষের মুভি ক্যামেরাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কয়েকটা ফিল্ম সে আগেই অনিমেষকে দিয়ে ডেভলাপ করতে পাঠিয়েছিল। সে ক'টাই যা বাঁচবে। বেশির ভাগ ফিল্মের স্পুলই ছিল ক্যামেরার ভেতর। সেগুলো শেষ হয়ে গেল। টেপ রেকর্ডারটা এখন গোটা কয়েক ভাঙা টুকরো মাত্র। দামি মুভি ক্যামেরাটার কথা আর ভাবাই যায় না। নোট বইয়ের কাগজগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে গেছে। এমনকি তার জামাকাপড় পর্যন্ত আস্ত নেই, হাতের কাছে যা পেয়েছে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলেছে ফন্টার গ্যাংয়ের ছোকরারা।

এতদিনের পরিশ্রম একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। ঘরজোড়া ধ্বংসাবশেষের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে সুজাতা, 'কী করছেন আপনারা, এ কী করছেন?'

কেউ উত্তর দেয় না। সুচারুভাবে কাজটি সমাধা করে দু-তিনটে ছোকরা সুজাতার কাছে এগিয়ে আসে। একজন তার মুখে কাপড় গুঁজে দেবার আগে 'অনিমেষ বাঁচাও—' এই শব্দ দুটোই শুধু গলার ভেতর থেকে বার করে আনতে পারে সুজাতা।

অনিমেষ মুখ তুলে তাকায় না, তার মাথা বুকের ওপর আরো একটু বেশি করে ঝুলে পড়ে যায়। সুজাতা বুঝতে পারে কলকাতার এক ক্লীব স্বার্থপর ভীরু মৃতপ্রায় যুবকের কাছ থেকে সাহায্যের কোনো আশাই নেই।

ততক্ষণে দুটো ছোকরা তাকে কাঁধে তুলে বাইরে নিয়ে এল। সুজাতা হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। এধারে ওধারে বস্তির কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। নিঃসাড় স্তব্ধ আতঙ্কিত স্লাম এরিয়ায় তাকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই।

কে যেন বলে, 'গুরু, মালটাকে কোথায় নিয়ে যাব?'

ফন্টা বলে, 'রেললাইনের দিকে চল—'

সুজাতাকে নিয়ে সবাই বস্তির অলিগলি দিয়ে ভৌতিক অন্ধকারে দৌড়ুতে থাকে। দু'জন দু'পাশ থেকে তার দুটো হাত ধরে রেখেছে।

পেছন থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে বলে, 'সীতাকে পাওয়া গেল না গুরু। শালী হাওয়া হয়ে গেছে।'

ফন্টা বলে 'পরে ওর ব্যবস্থা হবে। এখন যেটাকে পাওয়া গেছে তাকে একটু টেস্ট করে দেখি—' কর্কশ গলায় অন্ধকার রাতকে ফেড়ে সে হেসে ওঠে।

কী উদ্দেশ্য এদের? সুজাতা ভাবে, সে তো কারো ক্ষতি করতে এখানে আসে নি। বরং পভার্টি লাইনের নিচের এই সব মানুষদের কথা গোটা পৃথিবী যাতে জানতে পারে, সেই কারণেই তো তার এখানে আসা। অথচ এরা তাকে কোন নরকে নিয়ে চলেছে? সুজাতা সমানে হাত-পা ছুঁড়েই চলল। কিন্তু এতগুলো জন্তুর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব।

অন্য দিনে পরিতোষ, ও.সি. সরকার বা প্লেন ড্রেসের পুলিশরা কেউ না কেউ আসেই। কিন্তু আজ তাদের কাউকেই দেখা যায় নি। তা ছাড়া শঙ্করই বা গেল কোথায়? তার প্রোটেকশানের বেশির ভাগ দায়িত্বই তো ছিল শঙ্করের। না কি ফন্টার গ্যাং দেখে ভয়ে সে পালিয়ে গেছে?

কয়েক মিনিটের ভেতর ফন্টারা তাকে রেল লাইনের ওপর নিয়ে এল। এখানেও আলো টালো বিশেষ নেই। ঝাপসা কুয়াশায় অগুনতি গুডস্ ট্রেন বিশাল বিশাল ভূতুড়ে সরীসৃপের মতো এধারে ওধারে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ কে যেন ফড় ফড় করে সুজাতার ব্লাউজটা একটানে ছিঁড়ে ফেলল। এরা শুধু মস্তানই না, রেপিস্টও কি? ভাবতেই শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে হিমের স্রোত বয়ে যেতে লাগল। এর মধ্যে কে আবার যেন শাড়ি টেনে খুলতে চাইছে।

সর্বনাশের শেষ মাথায় পৌঁছে শরীরের যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে। একসঙ্গে সেটুকু জড়ো করে এক ঝটকায় ডান হাতটা ছাড়িয়ে মুখের কাপড় বের করে চেঁচিয়ে উঠল ; সুজাতা, 'ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে—' পায়ের সামনে যারা ছিল তাদের দিকে উন্মাদের মতো পা ছুঁড়তে লাগল। নখ দিয়ে ডান ধারের ছোকরার গাল ছিঁড়ে ফেলল।

ফন্টারা প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। সুজাতার দিক থেকে আক্রমণ

তারা ভাবতে পারে নি।

কিছু একটা করতে বা বলতে যাচ্ছিল ফন্টা, তার আগেই গোটা রেল ইয়ার্ড কাঁপিয়ে পাঁচ শ গজ দূরে অনবরত বোমা ফাটতে লাগল। আগুনের ঝলক মাটি থেকে অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে পাইপগানের গুলির আওয়াজ।

ফন্টার দলের ছোকরারা চমকে দাঁড়িয়ে গেল। আবছা অন্ধকারেও বোঝা যায় বোমা আর পাইপ গান চালাতে চালাতে ঝড়ের গতিতে কারা যেন দৌড়ে আসছে।

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ নেলো বলল, 'শঙ্করের গ্যাং। শালারা টের পেয়ে গেছে।'

ফন্টা চেঁচিয়ে বলল, 'পেটো ঝাড়, পাইপ চালা—'

ফন্টার গ্যাংও পাল্টা চার্জ করতে শুরু করল। যে ছোকরা দুটো সুজাতাকে ঘাড়ে করে এনেছিল , তারা তাকে রেল লাইনে ফেলে পাইপ গান চালাতে লাগল। মুহূর্তে গোটা রেল ইয়ার্ডটা যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিল। গুলি বা স্প্লিন্টার লেগে দু পক্ষেরই একজন দু'জন করে চিৎকার করেই লুটিয়ে পড়ছে।

কতক্ষণ যে ফাইট চলল, মনে নেই। এই যুদ্ধ বুঝিবা আর শেষ হবে না। ফন্টার দলের সঙ্গে সুজাতা মানসিক বা শারীরিক যে জোরটুকু দিয়ে লড়াই চালিয়েছিল তা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। রেল ইয়ার্ডের খোয়ার ওপর পড়ে থেকে বোমা আর গুলির আওয়াজ শুনতে শুনতে তার চোখে চাপ চাপ অন্ধকার নেমে এল। চেতনার শেষ অন্তরীপ যখন কোন অতলে ডুবে যাচ্ছে সেই সময় শঙ্করের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় তার। শঙ্কর তার যে দায়িত্ব নিয়েছিল, সেটা শুধু ফাঁকা মৌখিক প্রতিশ্রুতি না। প্রোটেকশনের কথা সে ভোলে নি, আর সেই কারণেই তাকে বাঁচাতে দলবল নিয়ে ছুটে এসেছে।

জ্ঞান ফেরার পর সুজাতা দেখল, সে অনিমেষদের বাড়িতে তার নির্দিষ্ট ঘরটিতে শুয়ে আছে। চারপাশে বহু মানুষের ভিড়। শিবনাথ, স্নেহসুধা, অশোক, অনিমেষ, মঞ্জিরা, পরিতোষ—এমনি অনেকে।

একটু সুস্থ হবার পর তার সব মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'আমি এখানে কী করে এলাম?'

পরিতোষ জানালো, মস্তানদের মারামারির পর রেলের একদল কুলি সুজাতাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে শিবনাথরা তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। সুজাতাকে শারীরিক কোনো করা ক্ষতি হয় নি। শকে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

এসব কিছুই শুনছিল না সুজাতা। সে শুধু বলল, 'শঙ্কর কোথায়?'

'হাসপাতালে। ওর পেটে গুলি ঢুকে গিয়েছিল। অপারেশন হয়েছে। কখনও সেন্স ফিরছে, আবার কখনও অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।'

'আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন।'

'এখন তার কাছে যাওয়া ঠিক হবে না।'

সুজাতা প্রায় জেদই ধরল, 'সে না থাকলে আমার চরম ক্ষতি হয়ে যেত। তার এই অবস্থায় না গেলে নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে পারব না।'

একরকম জোর করেই সুজাতা হাসপাতালে চলে এল। করিডরে সীতা এবং মলিনা করুণ মুখে শঙ্করের ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একজন সিনিয়ার ডাক্তার ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এলেন। সুজাতা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'শঙ্কর সরকার কেমন আছেন?'

ডাক্তার গম্ভীর মুখে জানালেন, 'জ্ঞান ফিরেছে। তবে এখনও ডেফিনিট কিছু বলা যায় না।'

'আমি পেশেন্টকে একটু দেখতে চাই—'

'ইমপসিবল।'

'দয়া করে পারমিশান দিন।'

অনেক কাকুতি মিনতির পর ডাক্তার সদয় হলেন। বললেন, 'দেখেই চলে আসবেন। রোগীর এ অবস্থায় কাউকে আমরা তার কাছে অ্যালাউ করি না।' বলে ডাক্তার করিডর ধরে ডান দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুজাতা ওয়ার্ডে ঢুকে গেল। মলিনা আর সীতা এই সুযোগটা নিল, তারাও সুজাতার পেছনে পেছনে ভেতরে চলে এল।

আচ্ছন্নের মতো বেডে শুয়ে আছে শঙ্কর। সুজাতা কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এই ছেলেটা প্রায় নিজের জীবনের দামে তাকে বাঁচিয়েছে। অদ্ভুত এক আবেগ বুকের গভীর থেকে উঠে এসে গলার কাছে যেন পুঞ্জীভূত হতে লাগল। মনে হল, চোখের শিরা ফাটিয়ে স্রোত নামবে।

এক সময় নিজের অজান্তেই শঙ্করের বুকে একটা হাত রাখল সুজাতা। আস্তে আস্তে চোখ মেলল শঙ্কর। রক্তাভ ঘোলাটে দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সুজাতাকে চিনতে পারল সে। বলল, 'আপনি।'

অনেক কষ্টে আবেগ সামলে নিয়ে সুজাতা গভীর গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুন। আমার জন্যে আপনার এই অবস্থা হল!'

বিড় বিড় করে আবছা দুর্বল গলায় কিছু বলল শঙ্কর। সুজাতা যেটুকু বুঝতে পারল তা এইরকম। শঙ্করের মতো ছেলেদের মৃত্যু এভাবেই হয়, সুজাতা উপলক্ষমাত্র। তারপর বলল, 'আমি বাঁচব কিনা জানি না। যদি ফুটে যাই, সীতা আর মাকে একটু দেখবেন। ওদের আর কেউ নেই।'

একদা বৃটিশ ইণ্ডিয়ার রাজধানী এই কলকাতা ভাঙতে ভাঙতে কোথায় এসে পৌঁছেছে তা দেখার জন্যই এখানে এসেছিল সুজাতা। বইটই পড়ে, সোসিওলজিস্ট এবং অর্থনীতিবিদদের কাছে শুনে তার মনে হয়েছে এ শহরের অতীত ছাড়া আর কিছুই নেই। সামাজিক এবং অর্থনীতিক দিক থেকে কলকাতা ধ্বংস হয়ে গেছে। ক্ষয়, পতন আর অনিবার্য বিনাশের অতলে এই শহর দ্রুত ডুবে যাচ্ছে। 'হিউম্যানিটি' বা ভ্যালুজ বলতে যা বোঝা যায় তার কণামাত্র অবশিষ্ট নেই এখানে, বিশেষ করে এখানকার বস্তিগুলোতে। ওই শব্দদুটোর দীপ্তি এবং মহিমা ক্ষয়ে ক্ষয়ে একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু অন্ধকারে নিমজ্জমান কলকাতার ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে শঙ্করকে দেখতে দেখতে অন্য কথা মনে হয় সুজাতার। চূড়ান্ত ধ্বংসের মধ্যেও মনুষ্যত্বের একটু তলানি এখনও এ শহরে অবশিষ্ট আছে।

সুজাতার চোখে জল এসে যায়।